সোনালি বিহঙ্গ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তিন সঙ্গী ॥ ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পয়লা বৈশাখ, ১৩৬৯
এপ্রিল, ১৯৬২

প্রকাশিকা : রেবা গঙ্গোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : শ্রী [illegible]লচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : প্রণয় সেন

শ্রীমতী ইতি গঙ্গোপাধ্যায়

সুচরিতাসু

আমাদের প্রকাশিতব্য এই লেখকের

আর একটি

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের চিরকালের উপন্যাস

হৃদয়ের পথে খুঁজো

সোনালি বিহঙ্গ

কেউ জিজ্ঞেস করে না, কারণ, কেবল উপদেশ বিলনো ছাড়া পনের বছরের জ্যাকির মনের কথা জানার বা জানতে চেষ্টা করার লোক এ-বাড়িতে নেই—তবু যদিই কেউ জিজ্ঞেস করে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে আনন্দের আর সব থেকে শান্তির জায়গা কোনটা, জ্যাকির এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হত না—ও চোখ-কান বুজে বলে দিত, এই ঘরটা, তিন তলার ছাদের এই একান্ত নিজস্ব ঘরখানা। পৃথিবীর ও কিছুই দেখেনি অবশ্য, কিন্তু জানে তো অনেক। কত যে জানে বাড়ির কারো ধারণাই নেই। এই জন্যেই তুই দিদি আর দাদা বউদির ও ঠাট্টার পাত্র। জ্যাকি নামটা দাদার দেওয়া। আসলে ওর নাম দীপু। প্রদীপ বোস। কিন্তু এক বাবা মা ছাড়া ওই দীপু নাম বাড়ির আর কারো মুখে শোনা যায় না। কিন্তু আর সকলে ঠাট্টা ছেড়ে ওকে দরকারী কাজে ডাকতে হলেও জ্যাকি বলে হাঁক দেবে। দাদার এই ঠাট্টার নামকরণের জন্য গোড়ায় গোড়ায় দীপুর একটু দুঃখ হত। মুখে বলার সাহস নেই, মনে মনে জিভ ভেঙচাতো —জ্যাকি তুমি!

দাদার এমন নামকরণের অর্থ, দীপু হল গিয়ে জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান। মানে দাদা আর দাদার সঙ্গে আর সকলেও বলতে চায়, সর্বব্যাপারে ওর অল্প বিদ্যে, পাকা কোনদিন কোনো কিছুতে হবে না। এমন বিচ্ছিরি নাম দেওয়ার কারণ অবশ্য আছে। কিন্তু সে পরের প্রসঙ্গ। এখন ওই নাম গা সওয়া হওয়া হয়ে গেছে। দোতলা থেকে কেউ জ্যাকি বলে হাঁক দিলে দীপু সাড়াও দেয়।

···যাক, যে যেমনই ভাবুক, আর যত ঠাট্টাই করুক, পৃথিবীর অনেক কিছুই দীপু জানে। জানে যে সেটা একমাত্র স্বীকার করেন বুড়ো মাস্টারমশাই। অনাথবন্ধু শিকদার। একসময় দাদাও তাঁর কাছে পড়েছে। তারপর দিদিরা পড়েছে। ছোড়দি এখনো দরকার হলে ওই মাস্টারমশাইয়ের কাছে আসে। এই মাস্টারমশাইয়ের সামনে অন্তত ওকে জ্যাকি বলার সাহস কারো নেই। দিদিদের না, এমন কি দাদারও না। এর মোক্ষম দাওয়াই তিনিই দিয়েছিলেন। জ্যাক অ্যাকি শুনে তিনিই একদিন দাদাকে বলেছিলেন, যতো ঠাট্টাই করো, বড় হয়ে ও যখন কোনো কিছুতে স্থির হবে তখন আর জ্যাকি থাকবে না—এ বয়সে সবেতে এত যার কৌতূহল জীবনে সে খুব পিছিয়ে থাকে না—এত বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে তো আর কম ঘাঁটলাম না—দেখে নিও।

দাদা একেবারে চুপ মেরে গেছল আর আড়াল থেকে শুনে দীপুর কি-যে আনন্দ হয়েছিল সে-ই জানে। আই আই টি থেকে ভালো পাশ করে শুরু থেকেই মোটা মাইনের চাকরিতে বহাল হয়েছে বলে দাদার মনে খুব অহংকার। আর এই কারণেই বাবা মায়ের চোখের মণিটি। অত বিদ্বান যেন আর কেউ হয় না। তার আঁতেও ঘা লেগেছিল বোধহয়। পরে মাকে বলেছিল, দীপুর ওই মাস্টারই না বেশি উৎসাহ দিয়ে বিগড়ে দেয়।

মোটকথা পনের বছরের দীপু পৃথিবীর অনেক জানে, অনেক কিছুরই খবর রাখে। এই দীপুকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে শান্তির আর সব থেকে আনন্দের জায়গা কোনটা— এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে সে তার নিজস্ব এই ছাদের ঘরটা দেখিয়ে দেবে। এই ঘরটায় এসে ঢুকলেই সে যেন নিজের একটা আলাদা জগতে চলে এলো। এই ঘরের বাতাসই একেবারে অন্য রকম।

বছর দশেক বয়সে দীপুর শক্ত ব্যামো হয়েছিল। পরে শুনেছিল টাইফয়েড। খুব যন্ত্রণা হত মাথায় মনে আছে। মা তখন রাত

জেগে বসে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোতো, কি আরাম লাগত আর কি-যে তখন ভালো লাগত দীপুই জানে। এই ঘরটায় এলে দীপুর তেমনি আরাম লাগে, তেমনি ভালো লাগে। মা অসুখের সময় আর যন্ত্রণার সময় গায়ে মাথায় হাত বোলাতো, আর এই ঘরের বাতাস বিনা যন্ত্রণায় বিনা অসুখেও সর্বদাই যেন তাই করে।···ওর বয়সের কোনো ছেলের পড়ার সাহায্য হতে পারে এমন অনেক বই তো আছেই—তা ছাড়াও কত বিষয়ের কত রকমের বই আছে। এই লাইব্রেরি ও বানিয়েছে মাস্টারমশাইয়ের উৎসাহে। তাঁর এক ভাইপো কোন কাগজের অফিসে সাহিত্য বিভাগে কাজ করে। সেখানে সমালোচনার জন্য হরেক রকমের বই আসে। দীপুর বয়সী কেন, তার থেকে কিছু বয়স্ক ছেলেদের কাজে লাগতে পারে বা জ্ঞান বাড়তে পারে মনে হলে সে সেই বই এনে জ্যাঠাকে অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে দেয়। মাস্টারমশাই ভাইপোকে বলেই রেখেছেন। কি বই এলো আগে তিনি উল্টেপাল্টে দেখে নেন। পছন্দ হলেই সে-বই দীপুর ঘরে চলে আসে।···তা ছাড়া কেনা বইও বড় কম নয় এ ঘরে। জন্মদিন-টিন এলে আগেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয় বাবা। মা-র কাছ থেকে আর দাদা বৌদির কাছ থেকে কি-কি বই আদায় করবে। উপহার বলতে ও জানে কেবল বই। বই আরো বই।

বাবার পিছনে লেগে থেকে মাস্টারমশাই তো মোটা আট ভলিউমের 'চিলড্রেনস লাইব্রেরি অব নলেজ" পুরো সেটটাই কিনিয়ে ছেড়েছেন। পাঁচশ টাকার ওপর দাম। মাস্টারমশাই অবশ্য আর একটু বেশী দিয়ে মাসিক কিস্তিতে টাকা দেবার কথা বলেছিলেন। তা বাবার মন হলে পাঁচশ টাকা তখন আর কি তাঁর কাছে। সব টাকা একেবারেই দিয়ে দিয়েছিলেন। নামে চিলড্রেনস লাইব্রেরী অব নলেজ—কিন্তু সে-বই পড়লে চিলড্রেনের ঠাকুরদারাও পৃথিবীর তামাম খবর আর তামাম মজাদার ব্যাপার জানতে পারে। আর পাতায় পাতায় অসংখ্য রং-বেরঙের ছবি দেখেও কত কি শেখা যায়

আর জানা যায় তার লেখাজোখা আছে? এদিকে স্কুলের পরীক্ষায় তো ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ডের মধ্যে একজন হয়ই। গত দুটো বছর পর-পর থার্ড হবার জন্য বাবা অবশ্য অসন্তুষ্ট। কারণ দাদাই তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছে ফার্স্ট হবে কি করে, এত আজেবাজে বিষয়ে মন দিলে হয় কিছু—ওর ওই জ্যাকি হওয়াই কপালে আছে। যাক, থার্ড হলেও স্কুল প্রাইজ আছে, আর প্রাইজ মানেই বই। তা ছাড়া প্রত্যেক বছরের জেনারেল নলেজের প্রাইজবই পাওয়া তো দীপুর বাঁধা-ধরা। সমস্ত স্কুলের সব ক্লাস মিলিয়ে কম্পিটিশন হলেও এই প্রাইজ যে ও-ই পেত তাতে ওর সন্দেহ নেই, মাস্টারমশাইরও না। এর ওপর নিজের অল্পসল্প হাত খরচের পয়সা আর মায়ের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে পাওয়া টাকা থেকে যা জমে তার বদলেও বই ছাড়া আর কি আসে। খাওয়ার লোভটা একটু বেশি বলেই, তা না হলে আরো টাকা জমত, আরো বই আসতে পারত।

…কিন্তু আজ এই শান্তির জগতে এসেও দীপু একটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যা কখনো হয় না আজ তাই হচ্ছে। ঘরের দরজা শুধু নয়, সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠার দরজা দুটো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে পনের বছরের দীপু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গেই সমস্ত সম্পর্ক ছেঁটে দিতে চায়। অথচ পারছে না। ভিতরটা থেকে থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।· বাবা বরাবর গম্ভীর মানুষ, কথাবার্তা কম বলেন। বাড়ির মধ্যে দাদাই যা তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথা-বার্তা বলতে পারে। দিদিরা তো বটেই, মা পর্যন্ত বাবাকে বেশ সমীহ করে চলে। দীপু বাবাকে ভয় একটু করে বটে, কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধা তার থেকে ঢের বেশি করে। এই শিক্ষাটুকুও মাস্টারমশাইয়ের।

রোজ রাত আটটা সাড়ে আটটার পর বাবার ঘরের দরজা ঘণ্টাখানেকের জন্য বন্ধ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ির সকলে এই ব্যাপারটা দেখে আসছে। একমাত্র মা ছাড়া তখন বাবার ওই ঘরে কেউ ঢুকত না। আর মাঝে-সাজে সেই ঘরে আধবুড়ো কমবাইনড্

হ্যাণ্ড ফণীর ডাক পড়ত—এখনো পড়ে। বছরখানেক হল সেই ঘরে দাদাকেও ঢুকতে দেখছে দীপু।

…বাবার ঘরের দরজা ও-সময় কেন বন্ধ থাকে সেটা দীপু তিন বছর আগে থেকেই জানে। কৌতূহল বাড়লে না জানা পর্যন্ত তার শান্তি আছে? ফণীকে জিজ্ঞেস করে উত্তর পায়নি, দিদিদের জিজ্ঞেস করে ধমক খেয়েছে। শেষে ফণীর যাওয়া আসার ফাঁকে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কয়েক পলকের জন্য ভেতরের ব্যাপার দেখেছে—দেখে তেমনি ধাক্কাও খেয়েছে। বাবা এই সময় নিজের ঘরে বসে মদ খায়। মদ-খাওয়া মাতাল লোক রাস্তায় দীপু অনেক দেখেছে। অকারণে গালিগালাজ করতে দেখেছে, রাস্তায় মুখ থুবড়েও পড়তে দেখেছে। দীপুর খুব খারাপ লাগত। অবশ্য বাবার বেলা এসব কখনো দেখেনি। মদ খাবার পরেও যেমন গম্ভীর তেমনি। তখন বরং আরো একটু চুপচাপ। কিন্তু বাবার সম্পর্কে ওর যা ধারণা তাতে ব্যাপারটা বোঝার পর বেশ শকই পেয়েছিল। সেটা দূর করেছিলেন মাস্টারমশাই। তাঁকে বলতে পারে না দীপুর এমন কথা নেই। ওর এই জগৎটা বলতে গেলে মাস্টারমশাইরই তৈরি। শুনে তাঁকে একটুও বিচলিত মনে হয়নি দীপুর। তিনি বেশ সাদাসিধেভাবেই বলেছিলেন, সমস্ত দিনের এত পরিশ্রমের পর এটা হয়তো তাঁর ওষুধের কাজ করে। তাতে দোষের কি হল। মদ খাওয়া এক জিনিস আর মাতাল হওয়া আর এক জিনিস। দরকার বুঝলে ডাক্তারও তো ও-সব প্রেসক্রাইব করে থাকে।

মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে দীপু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। বাবার ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা চিড় খায়নি। আর মা-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা কতটা করে জানে না, কিন্তু মনে মনে দারুণ ভালোবাসে। ভাবতে ভালো লাগে মায়ের মতো এমন উদার আর সরল কেউ হয় না। মায়ের অনেক সময় অনেক ছোটখাট ত্রুটি চোখে পড়ে। অনেক সময়

সে-রকম দোষ না থাকলেও সাবিত্রী আর যমুনাকে ধমকায়। একজন ঘর-দোর ঝাড়া মোছা করে আর একজন দুবেলা বাসন মাজে, বাঁটনা বাঁটে। এই ঠিকে ঝি দুটোর ত্রুটি মায়ের চোখে লেগেই আছে—বিশেষ করে যমুনার। ওর বয়েস কম বলেই যেন মা উঠতে বসতে দোষ ধরতে ছাড়ে না। কিন্তু দীপুর বদ্ধ ধারণা, ওরা মায়ের ভিতরের স্নেহের খবর রাখে না বলেই তর্ক করে রাগ করে। বাড়িতে একটু বাড়তি খাবার-দাবার ব্যবস্থা থাকলে মা যে ওদের জন্যেও কিছু সরিয়ে রাখে এটা দীপুর নিজের চোখে দেখা। তা ছাড়া ওদের কারো বা ফণীর শরীর খারাপ হলে মা তক্ষুণি ওষুধের টাকা বার করে দেয়। মুখে অবশ্য বলে, কেউ বিছানায় পড়ে থাকলে আমার চলবে! কিন্তু দীপু মায়ের ভিতরের স্নেহটুকুই বড় করে দেখে।

…তারপর দুই দিদি। কারণে অকারণে ওরা অনেক সময় দীপুকে শাসন করতে এলে বা খ্যাচখ্যাচ করলেও তাদের অনুদার ভাবে না। বড়দি অণিমা সাত বছরের বড় ওর থেকে আর ছোড়দি তনিমা চার বছরের। তবে ভাবখানা দেখায় যেন একজন সত্তর বছর আর একজন চল্লিশ বছরের বড়। তবু ছোটভাইকে মোটামুটি ভালই বাসে তারা। ওর জন্মদিনে মা-কে বলে একটু ভালো রান্নার ব্যবস্থা করে, নিজেরা মিষ্টি-টিষ্টি আনিয়ে ওকে চন্দনের ফোঁটা পরায়। তাই দিদিদের অনুদার ভাবার কারণ নেই দীপুর।

বাকি থাকল দাদা আর বউদি। দাদার বিয়ে হয়েছে তিন বছর আগে। বউদির কোলে একটা ছ-মাসের ছেলে। সে তাকে নিয়ে ব্যস্ত। দাদার বয়স এখন আঠাশ। বউদির চব্বিশ। দিদির থেকে মাত্র দু-বছরের বড়। এই দাদা-বউদির হাব-ভাব দীপুর খুব ভালো লাগে না অবশ্য। ভিতরে ভিতরে দুজনেরই বেশ দেমাক। বউদি বড়লোকের মেয়ে, আর দাদা তো নিজেকে মস্ত একজনই ভাবে। একবছর ধরে বাবার সঙ্গে রাতে মদের টেবিলে বসতে পেয়ে দাদা যেন আরো মাতব্বর হয়ে গেছে। বাবার বেলায় ভক্তি-শ্রদ্ধা চিড়

খায়নি বটে, কিন্তু দাদাও এই জিনিস ধরেছে আর আস্কারা দিয়ে বাবাও তাকে ডেকে নেয়—এটা একটুও ভালো লাগে নি দীপুর। শুনে মাস্টারমশাইও একটি কথা বলেন নি। অর্থাৎ তাঁরও ভালো লাগে নি। এমন কি দীপুর মনে হয় মুখোমুখি হলে দাদার সঙ্গে কথাবার্তাও আগের মতো বলেন না। ওদিকে তেরো বছরের বড় দাদা না হয় ওকে জ্যাকি বলে ডাকে, কিন্তু দেখাদেখি বউদিও তাকে ঐ নামে ডাকে কোন আক্কেলে? সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ মেয়ে হলেও জানে যে কত, দীপুর সেটা খুব 'ভালো জানা' আছে। বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় কার কি পোর্টফোলিও জানা দূরে থাক, সব কজন মন্ত্রীর নামও জানে না। এই যে সেদিন এতবড় একখানা খাদ্য আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেল, লাঠি গুলি চলল, আগুন জ্বলল, কত লোক খুন জখম হয়ে গেল কত-শত জেলে গেল—অথচ বৌদি কিনা রাতে খাবার টেবিলে বসেই দাদাকে জিজ্ঞেস করল, সব এমন ক্ষেপে গেল কেন—চালের দাম কত থেকে কত হয়েছে?

দাদাও তেমনি, হতভম্ব করে মায়ের দিকে তাকলো। মায়েরও ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। এই দীপুই বলে দিল, দু মাসের মধ্যে পাঁচ টাকা বেড়েছে—মোটা চাল উনত্রিশ টাকা মণ হয়েছে আর ভালো চাল পঁয়ত্রিশ টাকা। দাদার লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, বলে উঠেছিল, ভেরি গুড জ্যাকি!

সকলে হেসে উঠেছিল। বউদিও। কিন্তু তবু, এই দাদা বউদিকেও ঠিক অনুদার ভাবতে না দীপু। দাদা বা বউদির কাছেও কিছু মুখ ফুটে চাইলে পায়নি এমন কখনো হয়নি। ওর চাওয়ার মধ্যে অবশ্য বই ছাড়া আর কিছু নয়। ঠাট্টা করুক আর যা-ই করুক, উদার হয়ে টাকা দিয়ে দেয়।

কিন্তু আজ দীপুর এত যন্ত্রণার কারণ, গম্ভীর বাবার মুখে, উদার সরল মায়ের মুখে, দাদা-বউদির মুখে, এমন কি দুই দিদির মুখেও স্পষ্ট লোভের ছায়া দেখেছে দীপু। যে-কারণে আজ ব্যথায়

বুকের ভেতরটা এত টনটন করছে, সেই কারণেই বাড়ির সকলের মুখে চাপা খুশির ভাব একটু।

···রতনরা আজ এ-বাড়ির একতলাটা ছেড়ে দিয়ে বরাবরকার মতো চলে যাচ্ছে। গত আট বছর ধরে গোটা একতলাটা ভাড়া নিয়ে ছিল তারা। রতন দীপুর প্রাণের বন্ধু। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়ে। রতনের বাবা ছিল ডাক্তার। তখন দোতলার সকলের কাছে ওদের খাতির ছিল। কারো একটু মাথা ধরলে বা গা ম্যাজম্যাজ করলেই একতলার থেকে রতনের ডাক্তার-বাবার ডাক পড়ত। ভদ্রলোকের বয়েস এমন কিছুই না, বাবার থেকেও ছোট। দেড় বছর আগে ধুপ করে মরে গেল। সে কি অবস্থা ওদের বাড়ির তখন! রতনের দাদা তখন ডাক্তারি পড়ছে, দাঁড়াতে দেরি আছে। আর রতন তো দীপুর সঙ্গে পড়ে। এরপর কি করে ওদের চলবে বা চলতে পারে সেটা দীপুও অনেক ভেবেছে। পরে শুনেছে তার মামারা এগিয়ে এসেছে। দাদার ডাক্তারি পড়ার খরচ তারাই চালিয়ে যাবে—আর তাদের বাবা যা সামান্য রেখে গেছেন তাতেই রতনের পড়ার খরচ আর সংসারের খরচ কোনরকমে চলে যাবে।

কিন্তু তিন মাস না যেতেই বাবা যে ওদের উঠে যাবার জন্য তাগিদ দিচ্ছে, এ-খবর দীপু অনেক পরে জেনেছে। পরে জেনেছে কারণ রতনও আগে জানত না। সে-ই একদিন এসে বলেছিল, মেসোমশায় অর্থাৎ দীপুর বাবা নাকি প্রত্যেক মাসেই ওদের উঠে যাবার কথা বলছে। সম্পূর্ণ একতলাটা নাকি তাঁর দরকার। দীপু এত জানে, এত কিছু আঁচ করতে পারে, কিন্তু তার মাথাতেই ঢোকেনি গোটা একতলাটা বাবার হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ল কেন! আর এমন দরকার যে ওদের অমন দুরবস্থা জেনেও উঠে যাবার তাগিদ! ওরা যাবে কোথায়? রতন পড়া চালাবে কি করে? বাবা তার কনট্রাক্টরি ব্যবসা নিয়ে নতুন করে কিছু ভাবছে বলেও তো মনে হয় না। তাহলে কেন?

এরপর রতনের হবু ডাক্তার দাদাকেও দোতলায় এসে বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। কি কথা হয়েছে দীপু জানে না। কিন্তু তারপর বাবার মেজাজ ভালো দেখেনি।

কেন, তাও জানা গেল। অতবড় পাঁচ ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়া ওরা মাত্র একশ পঁচিশ টাকা দেয়। বাড়িয়ে সেটা ওরা দেড়শ টাকা করতে চেয়েছিল। বাবার মেজাজ নাকি তাতে আরো খারাপ হয়েছিল। রতনের দাদাকে বলে দিয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট না ছাড়লে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে।

অন্য ব্যবস্থা দেখলে ফল কি হত দীপু ঠিক জানে না। কিন্তু ওরা সকলেই বড় ভালো লোক। মাথার ওপর থেকে ওদের বাবা সরে যেতে আরো মিইয়ে গেছল। ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে যায়নি বা কোর্ট কাছারি করেনি। যাই-যাই করতে করতে শেষে স্কুলের পরীক্ষা হয়ে যেতে আজ চলল। মুখ শুকিয়ে রতন বলেছিল, ওর আর ওর মায়ের এরপর কলকাতায় থাকা হবে না। তারা দেশের বাড়িতে চলে যাবে। রতন সেখানকার গাঁয়ের স্কুলে পড়বে। আর ওর দাদা শুধু কলকাতার হস্টেলে থেকে ডাক্তারি পাশ করবে।···হ্যাঁ, আরো খবর দীপুর এর মধ্যে কানে এসেছে বই কি। রতনদের যাতে চলে যেতে না হয় এ-জন্য মায়ের কাছেও তদ্‌বির করেছিল দীপু। দিদিরাও তখন কাছে ছিল। মা ছোট ছেলের ওপর দস্তুরমতো অসন্তুষ্ট। ওকে ধমকেই উঠেছিল, তোর এ-সবের মধ্যে মাথা দেবার দরকার কি? যার বাড়ি সে যা ভালো বুঝছে তাই করছে—তোর নিজের যখন বাড়ি-ঘর হবে তখন যত খুশি উদারতা দেখাস!

মা চলে যেতে গোঁ ধরে দীপু দিদিদের বলেছিল, ও বাবাকেই একবার বলে দেখবে যাতে রতনদের যেতে না হয়। এখান থেকে চলে গেলে রতনের ভালো স্কুলে পড়া হবে না—ওর দাদার ডাক্তার হতেও অসুবিধে হবে। তাইতে দিদি রেগে গিয়ে সাবধান করেছিল, বলতে গিয়ে দেখ কি হয়—শুনলে দাদাও তোর কান ছিঁড়ে নেবে।

ছোড়দি ফড়ফড় করে বলে উঠেছিল,ওরা উঠে গেলে যাদের আসার কথা তাদের সঙ্গে দাদার কথা হয়েছে মাসে পাঁচশ টাকা ভাড়া দেবে—আর ঢোকার আগে দেবে ছ হাজার টাকা সেলামী—বুঝলি হাঁদা কোথাকার ?

দিদি তক্ষুনি ছোড়দিকে বকে উঠেছিল, এই তনু, ও ছেলেমানুষ। ওর কানে এ-সব ঢোকাচ্ছিস কেন—এরপর হয়তো পাঁচজনকে বলে বেড়াবে। কি-যে বুদ্ধি তোর না !

দীপু ওর ছাদের ঘরে চলে এসেছিল। একশ পঁচিশ টাকার জায়গায় মাস গেলে পাঁচশ টাকা ভাড়া পাওয়ার তফাৎটা দীপু বুঝেছিল। কিন্তু ছ হাজার টাকা সেলামী জিনিসটা কি মাথায় ঢোকেনি। ঘরে এসে বাংলা ডিকশিনারি খুলে বসেছিল। সেলামী ব্যাপারটা বোঝার পর বেশ শকই পেয়ে ছিল। ...বাবার আর দাদার কি সত্যি টাকার এত দরকার যে ঘুষ নিতে হবে ! বয়েস হওয়ার দরুণ বাবা আগের মতো হয়তো এত আর খাটতে পারছে না, আর যত দূর ধারণা—তাই রোজগারও ইদানীং কিছু কমে এসেছে। তা বলে অভাবের ছায়া কোথাও পড়েছে বলে তো মনে হয় না। পুরনো মডেলের হলেও এখনো তাদের একটা গাড়ি আছে। দাদা বড় চাকরি করে। আর পাঁচজনের থেকে তাদের খাওয়া দাওয়াও ঢের ভালো। নিজেদের বাড়ি ভাড়া লাগে না। অভাব যাকে বলে তার কিছুই তো নেই। তাহলে এ-রকম হল কেন ? আর মা বাবা দিদিরা পর্যন্ত এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছে না কেন ? এই এক ব্যাপারে বাবা আর দাদা—বিশেষ করে বাবা পনের বছরের দীপুর চোখে কোথা থেকে কোথায় নেমে এলো !

তারপর আজ।

সকাল থেকেই একতলার ফ্ল্যাটের ব্যস্ততা দোতলা থেকে সকলেই টের পাচ্ছে। এটা রবিবার। ছুটির দিন। সকাল আটটার মধ্যে বাড়ির সামনে একটা বড় লরি এসে দাঁড়াতে দেখা গেছে। তারপর

বাবা মা দাদা বৌদি দিদি ছোড়দি বারান্দায় এসে এসে এক-একবার সকলেই লরিতে মালপত্র বোঝাই হতে দেখছে। দাদা খানিক দাঁড়িয়ে দেখে ভিতরে এসে খুশি মুখে বলল, যাক, এরা সত্যি চলল তাহলে—

বউদির মন্তব্য আরো কানে বেঁধার মতো। দেড়টা বছর তো কাটিয়ে দিলে, কত আর টালবাহানা করবে, চক্ষুলজ্জা থাকলে ঢের আগেই যেত।

দিদি আর ছোড়দি সে রকম কিছু না বললেও বেশ আগ্রহ নিয়েই এক-একবার বারান্দায় গিয়ে দেখে আসছে। ওদের মুখ দেখেও মনে হয়েছে অনেক দিন বাদে একটা সমস্যার শেষ হল। বাবার মুখে পরিতুষ্ট গাম্ভীর্য। কিন্তু দীপু সব থেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছিল মায়ের দিকে চেয়ে। ভেবেছিল এতদিন একসঙ্গে থেকেছে নিচের তলার ওদের সঙ্গে—মা কে অদ্ভুত একটু মনমরা দেখবে। কিন্তু না। মায়ের ভিতরখানাও দীপু স্পষ্ট দেখছে, বুঝতে পারছে। মায়ের কর্তব্য করার ফাঁক দিয়েই মায়ের ভিতরটা ধরা পড়ছে। দাদাকে বলল, এবারে ভালো মিস্ত্রী ঠিক কর, যারা আসবে তারা তো আর বাড়ি ঘরের এই চেহারা দেখে আসবে না—লোকজন এসে কাজে লেগে যাক। সাবিত্রী আর যমুনাকে বলেছি, তোরা দুপুরে খেয়ে দেয়ে আসবি, নিচের ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে তকতকে করে ফেলবি—পাঁচটা করে টাকা দেব। ছেড়ে যাওয়া বাড়ির কি দশা হয় জানিস তো, পরিষ্কার না করলে নিচে পা ফেলা যাবে না।

দীপু তার তিনতলার ঘরে পালিয়ে এসেছে। রতন চলে যাচ্ছে, তার জন্য ভেতরটা পুড়ছে। মাসিমা আর অমিয়দার শুকনো মুখ বুকের তলায় খচখচ করছে। কিন্তু তার থেকে ভিতরটা ঢের বেশি দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে বাড়িসুদ্ধ লোকের এই স্বার্থপরতা দেখে। এতকাল থেকে আজ ওরা চলে যাচ্ছে · কেউ একবারটি নিচে গেল না, কেউ দুটো মুখের কথা বলল না। যারা যাচ্ছে তারা যেন শত্রু

ছিল, যতকাল ছিল এখানে যেন শত্রুতাই করে গেছে। আজ চলে যাচ্ছে, তাই সকলের স্বস্তি, সকলের মনের তলায় চাপা আনন্দ। বাস্তব জীবনের এই নিরানন্দের দিকটা দীপুর জানা ছিল না।

দীপু এ-দিক ও-দিকে তাকিয়ে বইয়ের সারিগুলো দেখছে। একটা কিছু বই চাই তার, যা ঠিক এই সময়েই ভালো লাগবে। কোথায় যেন সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকার উপদেশের কথা পড়ে ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কোনো বইয়ে বোধহয় না, মনে পড়তে হাত বাড়িয়ে একটা চটি বই টেনে নিল। সহজ গীতা। অল্প বয়সী ছেলেদের পড়ার মতো করে লেখা গীতার সচিত্র গল্প। এ বইও মাস্টারমশাইয়ের জোগাড় করা। দীপু দুই একবার পড়ে ফেলেছে, কিন্তু সুখে-দুঃখে অবিচলিত থাকার মতো পরিস্থিতিতে সে রকম পড়েনি বলেই খুব একটা মর্ম বুঝতে পারেনি। আর মায়া সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলো হেঁয়ালির মতো লেগেছে। কারো জন্যে মায়া থাকবে না এ কি হয় নাকি! কোন কিছুতে লোভ থাকবে না এ-ই বা হয় কি করে? মাংস খেতে ভালো লাগে, রাজভোগ খেতে ভালো লাগে— অথচ ও বলবে ভালো লাগে না? শত্রু হলেও আত্মীয় পরিজন বধ করা কোনো কাজের কথা নাকি! অর্জুনের বিষাদ ওর বরং ঢের বেশি স্বাভাবিক মনে হয়েছে। মাস্টারমশাইকে অনায়াসে মনের কথা বলেও ছিল। শুনে বুড়ো খুব হেসেছিলেন বলেছিলেন, আর একটু বড় হ, তখন বুঝবি গীতা কী অমৃত।

দীপু তর্ক করতে ছাড়েনি। জিজ্ঞেস করেছে, আপনার এই অমৃত বেশি ভালো লাগে না চা খেতে বেশি ভালো লাগে?

মাস্টারমশাই জবাব দেবেন কি, হেসে সারা।

মাস্টারমশায়ের চায়ের নেশা বটে। যতবার পাবেন ততো খুশি। দীপুর ইচ্ছা করে, বাড়ির ঢাউস এনামেলের কেটলিটা ভরাট করে চা বানিয়ে তাঁকে এনে খাওয়াতে। কত খেতে পারেন দেখতে। কিন্তু এখানে ওকে পড়াতে এলে এক পেয়ালার বেশি দু পেয়ালাই

জুটতে চায় না—এক পেয়ালা যে করে দিতে হয় সেটাই সকলের সব-সময় পছন্দ নয়। বউদি নিজে কখনো করে দেয়নি, কিন্তু মুখ বন্ধ থাকে না তা বলে। তার মতে বুড়ো মানুষের অত চা খাওয়ার কি?

মাস্টারমশাই দ্বিতীয় পেয়ালা কখনো মুখ ফুটে চান না। পেলে খুশি হন বুঝে দীপুই নিচে নেমে দিদি বা গোড়দিকে তোয়াজ তোষামোদ করে এনে দেয়। যদিও প্রথম পেয়ালা দেবার সময়েই তারা শাসিয়ে দেয়, ফের চাইলে হবে না বলে দিলাম।

এতদিন দীপু ভাবত আলিস্যিটাই আপত্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারের পর এই নিয়েও খটকা লাগল।...বড় বউদি নিজে হাতে কখনো চা বানিয়ে দেয় না। তবু বলে কেন? দ্বিতীয় দফা চা চাইলে মায়ের ভুরুতেও যেন একটু বিরক্তির আঁচড় পড়ে। তাহলে কি চা চিনি দুধের খরচাটাও এরা ভাবে নাকি? গীতায় এক ফোঁটাও মন বসল না দীপুর। বাড়ির মানুষগুলো সম্পর্কে ওর এ-ভাবে ধারণা বদলে যাচ্ছে বলেই যেন বেশি যন্ত্রণা।

...একতলার রতন ছিল দীপুর একমাত্র যোগ্য সমজদার। দীপু যা বলে ও তাই শোনে, তাই করে। তিন দিন আগে পর্যন্ত কাক-ডাকা ভোরে উঠে এই ছাদে এসে দুজনে এক্সারসাইজ করেছে। চার বছর ধরে একটানা এ-রকম চলছিল। দীপুর যোগব্যায়ামের দিকে ঝোঁক খুব। ঝোঁকের কারণ মাস্টারমশাই। তিনিই ছাত্রকে যোগব্যায়ামের মাহাত্ম্য বুঝিয়েছেন। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাতে মনের জোর স্নায়ুর জোর কত বাড়ে বলেছেন। বলার কারণ, দীপুর এমনিতে খেলা-ধুলোর দিকে ঝোঁক প্রায় নেই বললেই চলে। কোনো বইয়ে মনের মতো কিছু পেলে আর নড়াচড়ার নামও নেই। এই লক্ষণ দেখেই মাস্টারমশাই ওর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই যোগব্যায়ামের অলৌকিক গুণাবলীর জাল ফেলেছিলেন। বলা বাহুল্য দীপু নিজেকে সেই জালে জড়িয়েছে।

ব্যায়াম চর্চার ক্লাবে ভর্তি হবে শুনলে কোন বাবা মা আর আপত্তি করবে। বিশেষ করে যে ছেলের খেলাধুলো বা ছুটোপুটি করার দিকে মন নেই। আর প্রায়ই পেটের রোগে ভোগে।

এক মাইলের মধ্যে নাম করা যোগব্যায়ামের আখড়ার হদিসও দীপু মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছিল। সেখানে গিয়ে ভর্তি হয়েছিল। ছ মাস বেশ মন দিয়ে শিখেছে, অন্যান্য সকলের ব্যায়াম লক্ষ্য করেছে। যোগব্যায়ামের বইও একখানা কিনেছে। তারপর আখড়ায় যাওয়া ছেড়ে বাড়ির ছাদেই ওই চর্চা শুরু হয়েছে। এই এই শিক্ষায় দীপু রতনের গুরু হয়ে বসেছে। খুব ভোরে ছাদে উঠে দুজনে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই কসরত চালায়। দোতলায় সিঁড়ির দরজা তখন বন্ধ থাকে আর সেই চাবি থাকে মায়ের কাছে। রতনকে আত ভোরে ছাদে তোলার জন্য সেই চাবি চেয়ে মায়ের কাছে ধমক খেতে হয়েছিল। মা বলেছিল, রাত থাকতে ছাদে উঠবি, এদিকে চোর ডাকাত ঢুকে দিক সব ফাঁক করে।

কিন্তু চাবির জন্যে কিছু আটকায়নি। বাড়ির পিছনে সরু পেঁচানো পেঁচানো লোহার সিঁড়ি আছে একটা। দোতলা ছুঁয়ে ওটা তিন তলার ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। বাবা এ-বাড়িটা কেনার সময়ই নাকি ওটা ছিল। আর ক'বছর ধরেই তো শুনছে ওটা ভেঙে ফেলা হবে। কিন্তু ভাঙা আজও হয়নি, কোন কালে হবে বলেও মনে হয় না। দীপু ও রকম সিঁড়ির ইংরেজি নামও জানে। স্পাইরাল স্টেয়ার। দীপু তখনো দোতলায় থাকত, কিন্তু তার দোতলা থেকে তিনতলার ঘরে ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কোন বাধাই নেই। কারণ সিঁড়ির বন্ধ দরজা তো দোতলায় শেষ ধাপের পরে। রতন উঠে আসে ওই স্পাইরাল স্টেয়ার বেয়ে। এই পেঁচানো লোহার সিঁড়িটা যে আরো কতরকমের মজার সাক্ষী সে-শুধু ওরা দুজনেই জানে।

যোগব্যায়াম শুরু করার ছ মাসের মধ্যে দীপুর মনের সাহসও সত্যি সত্যি দারুণ বেড়ে গেছল। অন্তত ওর তাই মনে হত। তখন তো

বারো বছরেও পা দেয়নি—দেব-দেব করছে। সেবার সমস্ত কলকাতায় সাড়া পড়ে গেল রাশিয়া থেকে আসছে বুলগানিন আর নিকিতা ক্রুশ্চেভ। শুধু কলকাতায় কেন, দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজেও। যাক, কলকাতায় এই নিয়ে হৈ-হৈ কাণ্ড একেবারে। রতনটা তখনো জানেই না ক বুলগানিন আর ক নিকিতা ক্রুশ্চেভ। একজন প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার আর একজন ওদের কামিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি।—কি হাদারে তুই রতন, কত বড় মানুষ আমাদের সঙ্গে দোস্তি করতে আসছে জানিস?

এই উপলক্ষে স্কুল ছুটি, রতন এটুকুই শুধু জানে। কিন্তু দীপুর মাথায় অন্য মতলব। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক যাবে ওই দুই মস্ত মানুষকে দেখতে, আর ওরা যে জন্যে ছুটি তাদের না দেখে ঘরে বসে থাকবে! শ্যামবাজারে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখা যাবে—সেই রাস্তা দিয়েই ওই দুইজনকে দমদম থেকে রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হবে। শ্যামবাজারে তো বাড়ির গাড়িতে চেপে প্রত্যেক বছরই দুর্গাপ্রতিমা দেখতে যায়—বাসে উঠলে শেষ মাথায় শ্যামবাজার, আবার ফিরতি বাসে উঠলে বাড়ি। একমাত্র সমস্যা বাড়ির লোক দুপুরে বেরুনো বরদাস্ত করে না, আর বেরুনোর কারণ শুনলে তো মারতে আসবে।

কিন্তু তারা না শুনলে না জানলেই তো হল। এই লোহার প্যাঁচানো সিঁড়িটা আছে কি করতে। দীপু কাগজ দেখেই প্ল্যান এঁটে রেখেছে। বুলগানিন ক্রুশ্চেভ দমদমে নামছে বেলা দুটোয়, শ্যামবাজারে আসতে তাহলে আড়াইটে। ওরা দুপুর একটা নাগাদ স্পাইরাল স্টেয়ার দিয়ে নেমে গেলে কে আর ধরছে! এত বড় বাড়িটাই তখন নিঝুম। ফিরতে দেরি হলেই বা কি, কখন বেরিয়েছে জানবে কি করে—বিকেল চারটে সাড়ে চারটেয় বাড়ি থেকে বেরুতে তো আর মানা নেই।

···কিন্তু শ্যামবাজারের কাছাকাছি গিয়ে কি বিপাকেই না

পড়েছিল। বাসটাস নড়ার আর জায়গা নেই। মানুষের সমুদ্র। এক সঙ্গে এত মানুষ আর জীবনে দেখেনি দীপু। পর দিন সকালের কাগজে দেখেছিল দমদম থেকে সমস্ত পথে বিশ লক্ষ লোকের ভিড় হয়েছিল। ওরা দুজন পায়ে হেঁটেই এগিয়েছিল খানিকটা। তারপরে একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাবার দাখিল। যাদের দেখতে গেছল তাদের টিকির দেখাও মেলেনি। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে এই ঢের। কিন্তু সেই সঙ্গে আর যে বিপত্তি তাতেই ভাবনায় অস্থির দুজনে। দীপুর গায়ের জামা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গায়ের সঙ্গে ঝুলছে। ভিতরে গেঞ্জিও নেই। আর রতনের দু পাটি জুতোই হারিয়েছে। খালি পায়ে তবু বাসে যাওয়া চলে কিন্তু খালি গায়ে? এই সর্বনেশে ভিড়ের মধ্যে ওরা এসেছিল জানতে পারলে বাবার মুখখানা কেমন হবে ভাবতেও দীপুর হৃৎকম্প।

টুকরো টুকরো ছেঁড়া জামা পরেই আবার বাসে দুর্গানাম জপ করতে করতে দুজনে ফিরেছে। গলি দিয়ে বাড়ির পিছন দিকের রাস্তায় পড়ে এই লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি ধরেই সকলের অলক্ষ্যে সোজা তিনতলায়। বিকেল তখন সাড়ে চারটেও নয়। এই স্পাইরাল স্টেয়ার দারুণ বন্ধুর কাজ করেছে সেদিন। নিশ্চিন্ত হবার পর দুই বন্ধুর সে কি হাসি! একটা অভিযান হয়ে গেল বটে।

·· সেই রতনটা চলে যাচ্ছে।

···সেবারের সেই দারুণ বন্যার সময়েও দীপু আর রতন দুজনে বেশ একটা উত্তেজনার কাজই করে বসেছিল। বন্যায় পশ্চিমবাংলার তিন ভাগের এক ভাগ জলের তলায়। কাগজে দেখেছিল প্রায় সাড়ে আট লক্ষ লোক সব খুইয়েছে, আর দু লক্ষর মতো ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়েছে। কত যে হাহাকারের খবর কানে আসছে ঠিক নেই। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা বস্তির ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত দলে দলে সাহায্য তুলতে বেরিয়ে পড়েছে। পুরনো জামা-কাপড় চাদর টাকা-পয়সা যে-যা ফেলছে তাই মাথায় করে নিচ্ছে। কিন্তু এই বাড়ি থেকেই কিছু

পড়তে দেখল না দীপু। সাহায্য চাওয়ার দল এলে কেউ বারান্দাতেই দাঁড়াল না। বাবা দাদা বউদি না, এমন কি মা দিদি ছোড়দিও না! দীপুর রাগই হয়ে গেছল। রতনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছিল, দীপু তার সব থেকে ভালো জামাটা দেবে আর রতন তার সব থেকে ভালো হাফপ্যাণ্টটা দেবে—দুজনেরটা মিলিয়ে একটা ছেলের ফুল সেট হয়ে যাবে।

কিন্তু জিনিস দুটো দেবে কি করে—দেবে কেমন করে?

ওই লোহার সিঁড়ি থাকলে ভাবনা কি! দুটো কাগজের প্যাকেটে জামা প্যাণ্ট রেডি রাখা হল। দূরে সাহায্য তোলার দলের সাড়া পেয়েই ওই লোহার সিঁড়ি বেয়ে দুজনে নেমে এলো। পিছনের গলি দিয়ে ওদিকের রাস্তায়। হাতের প্যাকেট চালান করে দিয়ে সুবোধ বালকের মতো দুজনে আবার লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদের ঘরে।

···সর্বক্ষণের দোসর এই রতন আজ চলল।

চলে যাচ্ছে বলেই আনন্দের আর ব্যথার স্মৃতিগুলো বুকের ওপর চেপে চেপে বসছে।···দুবছরও হয়নি, সেই এক সকাল থেকে কী চাপা উত্তেজনা দুজনের। তখন পর্যন্ত দুজনের কেউ একটা টারজানের ছবি আর একটা জীব-জন্তুর ছবি ছাড়া আর কোনো সিনেমা দেখেনি। ওদিকে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি ছবি নিয়ে হৈ-হৈ তখন। পৃথিবীর সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে। ঠাকুরবাড়ির মঞ্চে বিধান রায় নিজে হাতে পরিচালক আর শিল্পীদের মেডেল দিয়েছে। সেই ছবি ওরা দেখবে না? চুপি চুপি দুজনে পয়সা যোগাড় করল, স্কুলের একজন বড় ছেলেকে দিয়ে ছুটির দিনের দুপুরের শো-র দুটি টিকিট কাটালো। স্পাইরাল স্টেয়ারের কল্যাণে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সিনেমা হল এ এলো। তখনো বুক ঢিপঢিপ—টিকিট থাকলেও তেরো বছরের দুটো ছেলেকে ঢুকতে দেবে কিনা কে জানে ভিতরে বসতে পেয়ে নিশ্চিন্তি। কিন্তু কী কুক্ষণেই না এসেছিল দুজনেই নিঃশব্দে কেঁদে অস্থির। কেউ কারো দিকে তাকায় না।

কেঁদে-কেঁদে চোখ লাল এক-একজনের। আর বুকের তলায় সে-কি যন্ত্রণা। রাতে কেউ ভালো করে ঘুমুতে পর্যন্ত পারে না। এত কষ্টের ছবি কেউ করে! পরদিন দীপু রতনকে বলেছে, যে প্রাইজই পাক, সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখলে তার কষ্ট হয়—। রতনও ওর সঙ্গে একমত হয়েছিল।··আর একবারের রোমাঞ্চকর স্মৃতিও শেষ পর্যন্ত দুঃখের। বছর দেড়েক আগের কথা। এ-ভাবে অ্যাডভেঞ্চার করে করে দুজনের সাহসও বেড়ে গেছল। আগের দিনের কাগজের সব থেকে বড় খবর, পরদিন কলকাতায় প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চলবে—দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আসবেন উদ্বোধন করতে। ইলেকট্রিক ট্রেন চলবে হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত। তেইশ কিলোমিটার পথ নাকি।

একটা বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যে কথা মাথা থেকে বার করতে দীপুর সময় লাগেনি।·····সেই সকালে যোগব্যায়ামের আখড়ায় মস্ত ফাংশন। পালোয়ানরা সব অনেক রকমের খেলা দেখাবে। সেই মিথ্যে কথা বলার সময় ভিতরটা একটু খচখচ করেছিল। কারণ, মাস্টারমশাইয়ের অনেক উপদেশের মধ্যে একটা বড় উপদেশ, মিথ্যে বলবি না, মিথ্যে যে বলে তার মতো ভীরু আর হয় না। মিথ্যের ফল কখনো ভালো হয় না। কিন্তু দীপু অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে, ও অন্তত যখন মিথ্যে কথা বলে বাধ্য হয়েই বলে। বড়রা অবুঝ বলেই মিথ্যে কথায় তাদের চোখে ধুলো দিতে হয়। সত্যি কথা বললে কি হবে? বাবা ধমকে ঘরে বসিয়ে রাখবে, অথবা যা-কে বলবে সেই বকাবকি করবে অথচ বই খুলে দেখো, সেখানে ছোটদের কত সাহস কত অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। পৃথিবীর কত সত্যিকারের বীর পুরুষের ছেলে-বেলার কথা পড়া আছে—কি দুরন্ত আর দুর্দান্ত সাহস ছিল তাদের। তাদের কি কারো বাবা মা দাদা দিদি ছিল না?

···যাক সকালে রতনকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের বাসে উঠেছে।

কিন্তু ওদের বাস আর হাওড়া ব্রিজ পেরুতে পারল না। মানুষ নয়, যেন মানুষের সমুদ্রের স্রোত হাওড়া স্টেশনের দিকে। বাস থেকে নেমে পড়ে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে ওরাও হেঁটে চলল। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের সেদিন এই চেহারা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। সেই মানুষ-সমুদ্রের ঢেউ পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ফেলল। তারপর ইলেকট্রিক ট্রেনে জায়গা পাবার জন্য হাজার হাজার মানুষের সে-কি পাগলের মতো কাণ্ড! না, দীপু আর রতন ইলেকট্রিক ট্রেনের ধারে কাছে পৌঁছুতে পারেনি। তিন-তিনটে লোক পায়ের তলায় পিষে মারা গেল, আর কতজনের প্রাণান্ত দশা হল ঠিক নেই। একজনকে ভিড়ের পায়ের তলায় পিষে মারা যেতে ওরা নিজের চোখে দেখেছে।···ফিরে আসার পরেও সেই বিভীষিকা কদিন চোখে ভেসেছে। দীপুর কেবলই মনে হয়েছে এটা বোধহয় মায়ের কাছে মিথ্যে বলার ফল, মিথ্যে কথা না বলে গেলে হয়তো এত বড় অঘটন ঘটত না। রতন আর দীপু দুজনে দুজনার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করেছে, খুব বিপদে না পড়লে আর কখনো মিথ্যে কথা বলবে না।

সেই রতন আজ কলকাতা ছেড়েই চলে যাচ্ছে। গ্রামের স্কুলে পড়বে। জীবনে আর হয়তো দেখাই হবে না। ওদের ফ্ল্যাটটা খালি হলে বাবা-মা দাদা-বউদি দুই দিদি সকলে পাঁচশ টাকা ভাড়া পাওয়ার কথা ভাবছে, ছ হাজার টাকা সেলামী হাতের মুঠোয় এসে গেল দেখছে। কিন্তু দীপুর যা খোয়া গেল তা কত টাকায় কেনা যায়?

দরজার গায়ে টক-এক শব্দ হতে দীপু বিষম চমকে উঠল। সাড়া দিতে গিয়েও দিল না।

আবার শব্দ। এবারে একটু জোরে। এই দীপু দরজা খোল··· আমরা চলে যাচ্ছি যে। রতনের গলা।

দীপু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে শক্ত হয়ে বসে রইল। ফলে দরজায় এবারে বেশ জোরেই ধাক্কা পড়ল। —দরজাটা খোল্ না! দীপু আমি রতন—এক্ষুণি আমরা চলে যাচ্ছি যে! কি কাণ্ড, এত বেল পর্যন্ত তুই ঘুমোচ্ছিস নাকি।

ার চুপ করে থাকতে পারল না। একেবারে ফেটে পড়ল।—ঘুমুচ্ছি দেখেও এ-ভাবে দরজা ধাকাচ্ছিস কেন—আমার শরীর ভালো না, বিরক্ত করিস না—ঘুমুতে দে!

রতনের কাতর গলা ভেসে এলো, আমরা এক্ষুণি চলে যাচ্ছি যে

দীপু আর জবাব দিল না। ঠোঁট কামড়ে বসে রইল।

মিনিট পনেরো বাদে উঠে দরজা খুলল। পায়ে পায়ে রাস্তার দিকের ছাদের কার্নিশে এসে দাঁড়ালো। লরিটা চলে গেছে সেখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সির পিছনে মাল তোলা হয়েছে। রতনের মা আর দাদা উঠল। রতনও সামনে উঠতে গিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে ছাদের দিকে তাকালো চোখাচোখি হতে ট্যাক্সিতে ওঠা ভুলে গিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে গেল। ঘাড় উঁচিয়ে দীপুকে দেখছে। ওর দাদার তাড়া খেয়ে বোধহয় আস্তে আস্তে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল। তারপরেও জানলা দিয়ে মুখ বার করে ছাদের দিকে চেয়ে আছে। ট্যাক্সিটা এগিয়ে যেতে হাত নাড়ল।

ছাদের ওপর দীপু নিশ্চল।

কেউ জানল না বাড়ির পনের বছরের একটা ছেলের জগৎ থেকে কি খোয়া গেল, কতটা খোয়া গেল। আর সে-জায়গায় বিদ্বেষ আর অবিশ্বাসের কত বড় ছায়া পড়ল। বাবা না মা না দাদা বউদি না দিদিরা না—কেউ জানল না।

॥ দুই ॥

দীপুর জগৎটা তার ইচ্ছে মতো বড় হয়ে উঠছিল গত তিন বছর
রে—তিন তলার এই ছাদের ঘরটা পাবার পরে। তিন বছর আগে
াবাকে তাগিদ দিয়ে মা এই বড়সড় ঘরটা তৈরি করিয়েছিল ঠাকুর
র করার জন্যে। নিরিবিলিতে পুজোআর্চা করার সুবিধে। সহজে
ন বসে। সেই বারো বছর বয়সে ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ পড়া
ার-কয়েক শেষ দীপুর। মন তৈরি করার জন্য ঠাকুর বলত, বন
ুঁজে নিবি নয়তো নিরিবিলি কোণ খুঁজে নিবি। পুজোর জন্য মায়ের
এই তিনতলায় ঘর তোলা মানে নিরিবিলি কোণ খোঁজা। তাই
ীপুও খুশি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ওরও খানিক নিজের মনে
াকার মতো একটা জায়গা হল। মা তো আর সর্বক্ষণ ঠাকুর ঘরে
সে থাকবে না।

কিন্তু ঠাকুরের আসল ইচ্ছেখানা কি তা যদি তখন জানত। ঘর
বার পরে ঠাকুর দেবতাদের আর ওপরে আনাই গেল না। মা হঠাৎ
ক অসুখে পড়ল। ডাক্তার পরীক্ষা-টরীক্ষা করে জানালো হার্টের
একটা ভ্যালভ খারাপ হয়ে গেছে। বাকি জীবন ভারী জিনিস
তালা বারণ, সিঁড়ি দিয়ে বেশি নামা-ওঠা বারণ।

মায়ের ঠাকুরকে এরপর আর তিনতলার ছাদের ঘরে তোলা হল
। বাবার হুকুম যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। দীপু কি তাতে
একটুও খুশী হয়েছিল? মোটেই না। তিনতলার ঘরটা যে কোনো
দিন ওর দখলে আসতে পারে তাও মনে হয়নি। বরং মায়ের জন্য
দারুণ দুশ্চিন্তা হয়েছিল। দু-তিনটে ডিকশনারি খুলে হার্টের ভ্যালভ

কি জিনিস বুঝতে চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার বলছে একটা ভ্যাল্ভ খারাপ হয়েছে, তাহলে কটা ভ্যালভ মানুষের বুকে থাকে? ডিকশনারি থেকে এসবের হদিস মেলেনি। ফলে মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করেছে। ওর বিবেচনায় মাস্টারমশাই একজন সব-জান্তা মানুষ। তাঁকেও হোঁচট খেতে দেখে দীপুর দুশ্চিন্তা আরো বেড়েছিল। উনিও জানেন না যখন হার্টের ভ্যালভ সাংঘাতিক কিছুই হবে। দীপু পারলে তখন নিজের বুকের একটা ভ্যালভ খুলে মায়ের বুকে লাগিয়ে দেয়।

সকলের নিশ্চিন্ত মুখ দেখে পরে অবশ্য বুঝেছে খুব একটা ভয়ের কারণ নেই। আর মা-ও কিছুদিনের মধ্যে সুস্থই হয়ে উঠেছে। তিন তলার ঘরখানা কি হবে সে-চিন্তা তখন পর্যন্ত ওর মাথায়ও আসেনি। ওই ঘর ওঠার কয়েক মাসের মধ্যে হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় ঢুকিয়ে দিল বড়দি। তা-ও ছোড়দির সঙ্গে ওর ঝগড়ার সুতো ধরে।

দীপুর তখন বইয়ের বায়ু ভালো মতো মাথায় চেপে বসেছে। দুই দিদি আর ও তখন একটা বড় ঘরে শোয়। দোতলার সাড়ে পাঁচখানা ঘরের মধ্যে একটা বৈঠকখানা, একটা ডাইনিং রুম, একটা বাবা মায়ের, একটা দাদার, আর একখানা ওদের তিনজনের। আর খুপরিটা ঠাকুর ঘর। দিদি তার কলেজে পড়া পড়ত বৈঠকখানায় বসে বা বাবা মায়ের ঘরে বসে। বাবা সেই সকালে বেরিয়ে যায়, দুপুরে খেতে এসে খানিক বিশ্রাম করে, ফের বেরিয়ে সন্ধ্যার পরে ফেরে। তাছাড়া দিদির কোনো অসুবিধা নেই, কোথাও জায়গা নিয়ে বসে গেলেই হল। দীপু পরে অবশ্য ধরে ফেলেছিল, দিদি পড়ার বই আড়াল করে বেশির ভাগ গল্পের বই পড়ে। দীপু অবশ্য সেটা কারো কাছে ফাঁস করেনি, শুধু দিদিকেই বলেছিল, অত মন দিয়ে যেখানে সেখানে বসে কি পড়া হয় আমি জানিনা ভেবেছ?

জবাবে দিদি কান ধরতে এসেছিল, কিন্তু কানের নাগাল পায়নি।

তাছাড়া দিদি সত্যিই ওকে শাসন করে না, আর ছোড়দির থেকে অনেক বেশি ভালবাসে। তার কারণ আছে। সে প্রসঙ্গ পরে।

যাক, ঝগড়া লেগেই আছে ছোড়দির সঙ্গে। শোবার ঘরে সর্বত্র দীপুর বই সাজানো। অত বড় ঘরের দেয়ালের তাকগুলোতে বেশির ভাগ ওরই বই। দীপু সেগুলো ঝাড়ামোছা করে, যত্ন করে, সাজিয়ে রাখে। ছোট দু তাকের সেলফটা বইয়ে ঠাসা হয়ে যেতে ছোড়দির সঙ্গে ঝগড়া করে একে একে তাক দখল করে চলেছে। কিন্তু ছোড়দির উল্টো স্বভাব। ওর বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে, কিন্তু জায়গা মতো সাজিয়ে রাখবে না। পড়া হয়ে গেলে হয়তো বিছানাতেই পড়ে থাকল। এই নিয়ে বকাবকি রাগারাগি লেগেই আছে। অন্যদিকে চার বছরের বড় ওর থেকে সেই জ্ঞান ছোড়দির টনটনে। বেশি কিছু বললে ঠাস করে এক দু'ঘা বসিয়ে দেবে। আবার কখনো বলবে, কত পড়া কেমন পড়া তোর আমি জানিনা? ইতিহাস পড়তে পড়তে ভূগোল বই খুলে বসিস, ভূগোল পড়তে পড়তে ইতিহাস—অঙ্ক করতে করতে ম্যাজিকের বই—স্বাস্থ্য পড়তে পড়তে বিজ্ঞানের বই—এর নাম পড়া? তোর কেমন পড়া হচ্ছে আমি বাবাকে দাদাকে দুজনকেই বলে দিয়েছি। তোর পড়া নিয়ে দাদা মাস্টারমশায়কে বলে দিয়েছে—এরপর তোর হবে একদিন।

অভিযোগটা একটুও মিথ্যে নয়। কিন্তু একটা পড়তে পড়তে ও কেন যে আর একটাতে চলে যায়—কেউ ভাবতেও পারে না বলে শুধু ভাবে ফাঁকি দিচ্ছে। আসল কথা, একটা কিছু পড়তে পড়তে মনে যে কৌতূহলটা বড় হয়ে ওঠে তার নিবৃত্তি না হলে দীপু আর এগোতেই পারে না। যেমন, ইতিহাস বই নিয়ে হর্ষবর্ধন পড়তে পড়তে এক জায়গায় পেল, প্রতি ছ বছর অন্তর প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে এসে মহাদাতা হর্ষবর্ধন ছ বছরের সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন অকাতরে দান করে এমন কি গায়ের চাদরখানা পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে চলে যেতেন।

এই একটা জিনিস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা বই না ঘেঁটে উপায় কি? প্রথমে ভূগোল বই খুঁজে বার করতে হবে প্রয়াগ কোথায়, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কোন কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় এসে মিলেছে। কিন্তু ভূগোলে এক প্রয়াগ খুঁজে পেতেই ঘণ্টা কাবার—কারণ সেকালের প্রয়াগ তো একালের ভূগোলে এলাহাবাদ হয়ে বসে আছে। ইউ পি-র সব কটা বড় জায়গা খুঁজতে খুঁজতে তবে এলাহাবাদে এসে প্রয়াগের পাত্তা। এ ছাড়াও এর পর সঙ্গম স্নান মাহাত্ম্য জানতে হবে—তিন নদীর জলের কি-কি রং তাই বা না জেনে থাকা যায় কি করে? আবার ভূগোলে মহীশূর পড়তে গিয়ে পেল টিপু সুলতানের কথা। তখন ভূগোল বাতিল, ইতিহাসে টান পড়ল। বীর যোদ্ধা অক্লান্ত পরিশ্রমী বিদ্বান আত্মমর্যাদায় ভরপুর এক মানুষের কথা পড়তে পড়তে ভূগোল ভুলেই গেল।···অঙ্ক কষতে কষতে হঠাৎ যদি মনে পড়ে যায় কোন্ ম্যাজিক বইয়ে একটা মজাদার অঙ্কের খেলা দেখেছিল—তখন সেই ম্যাজিক বই একবার না টেনে নিয়ে উপায় কি? স্বাস্থ্য বইয়ে মাইক্রোসকোপে কোন বীজাণুর কি-রকম চেহারা দেখা যায়, সেই ছবি দেখার পর মাইক্রোসকোপ যন্ত্রটার সম্পর্কে কিছু না জানলে চলে? এ-সবের জন্যেই পড়তে বসে দীপুকে একটা থেকে আর একটাতে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে হয়।

···ছোড়দির নালিশ শুনে দাদা ওকে কিছু বলেনি, কিন্তু মাস্টারমশায়কে যে দাদা কিছু বলেছিল তাতে আর সন্দেহ থাকল না। কারণ এর মধ্যে একদিন হঠাৎ মনঃসংযোগ নিয়ে মাস্টারমশাই অনেক কথা বলেছিলেন বটে। প্রত্যেকের মনই নাকি বাঁদরের মতো লাফাঝাঁপি করে বেড়ায়। যে-কোনো বিষয়ে বড় হওয়ার একমাত্র শর্ত সেই বাঁদরের গলায় শেকল পরানো, তাকে দখলে রেখে বশে রেখে লক্ষ্যের দিকে একাগ্রভাবে এগিয়ে দেওয়া। মনের লক্ষ্য স্থির না হলে কেউ কিছু করতে পারে না, সব বৃথা হয়ে যায়। যা যখন করবি একমনে করবি।

মাস্টারমশাইয়ের কথা দীপুর কাছে বেদবাক্য। এই মনের লক্ষ্য সম্পর্কে উনি একলব্যের কথা বলেছিলেন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথা বলেছিলেন। তাদের মতোই মন স্থির করে দীপু সেদিন পড়তে বসেছিল আর পড়তে পড়তে বার বার ভক্ত একলব্য আর নেপোলিয়নের শৌর্যের কথা মনে পড়ছিল। শেষে ওই চরিত্র দুটো আরো মনে বসিয়ে নেবার জন্য ছেলেদের মহাভারত বইটা খুলে আগে ভক্ত একলব্যের কথা পড়ে নিল। শেষে বীরকাহিনী বইটা টেনে নিয়ে নেপোলিয়নের ওপর চড়াও হল। দুটো শেষ করার পর আসল পড়াই আর এগলো না। ভক্ত একলব্যের জন্য তার গুরু দ্রোণাচার্যের ওপর রাগ হতে লাগল। আর নেপোলিয়নের ওয়াটারলুর যুদ্ধে হারাটাও বুকের তলায় খচখচ করতে লাগল। বিষণ্ণ মুখে আবার ম্যাপ বইটা টেনে নিয়ে খুঁজতে বসল, হারার পর এত বড় বীর যোদ্ধাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল যেখানে, অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের সেই সেণ্ট হেলেনা দ্বীপটা কোথায়।

যাই হোক, কি একটা বই না পেয়ে সেই তিন বছর আগের একদিন ছোড়দির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বেঁধেছিল। দোষ ছোড়দির, কিন্তু মা দীপুকেই বেশি বকছিল। এরই মধ্যে দিদি প্রস্তাব করে বসল, তিন তলার ঘরটা তো খালিই পড়ে আছে, দীপুকে ওটা ওর পড়ার ঘর করে দাও না, ও বাঁচুক আমরাও বাঁচি!

এ-রকম যে হতে পারে দীপুর এতদিন মাথায় আসেনি। একেবারে আলাদা নিজস্ব একখানা ঘর পেলে? পেলে যে কি হয় দীপু ভাবতেও পারে না। ছোড়দির ওপর রাগ ভুলে সাগ্রহে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। এত ভাগ্য কল্পনাও করতে সাহস হয় না।

মায়ের দ্বিধান্বিত মুখ।—সকালে ও-ঘরে গিয়ে পড়তে পারে··· রাতে ভয়টয় পেলে? মাস্টারমশাই তো সপ্তাহে মাত্র তিন দিন আসেন···

ভয়! দীপুর আকাশ থেকে পড়া মুখ। আট ন মাস হয়ে

গেল দস্তুর মতো যোগব্যায়াম চালিয়ে যাচ্ছে। শরীরের জোর বেড়েছে, স্নায়ুর জোর তার থেকে ঢের বেশি বেড়েছে। ভয়ের চিন্তা তার মনের ত্রিসীমানায়ও নেই। মাস্টারমশাইয়ের সপ্তাহে তিন দিন আসা বরাদ্দ বটে, কিন্তু চায়ের লোভে হোক বা ওকে দারুণ ভালবাসেন বলে হোক, কোনো কোনো সপ্তাহে যে পাঁচদিনও এসে হাজির হন, সে কথা আর মা-কে বলল না। চেঁচিয়ে উঠল, নিজেদের বাড়ির তিন তলায় থাকতে ভয় পাব আমি! তুমি আমাকে ভাব কি? সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মোক্ষম দুর্বল জায়গাটাতে ঘা বসালো।—রোজ তুমি ঠাকুর পুজো করো যে বাড়িতে সেই বাড়ির কোনো ঘরে আবার ভয় বলে কিছু থাকতে পারে! ঘরটা একেবারে খামোখা খালি পড়ে আছে আমার তো খেয়ালই হয়নি। ছুটে এসে দীপু আনন্দের চোটে দিদিকে জাপটে ধরল। সেই তিন বছর আগে দিদি উনিশ বছরের কলেজে-পড়া মেয়ে। বলে উঠল—দিদি, ছোড়দিটার হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচালে—কখন আমার কোন্ বই কি করে ফেলে সেই চিন্তায় চিন্তায় আমারও মায়ের মতো হার্টের ভ্যালভ খারাপ হতে বসেছিল।

অণু অর্থাৎ অনিমা হেসে ফেলে ওর মাথায় একটা চাঁটি বসিয়ে দিয়েছিল। আর তারপর দীপুর টানা হেঁচড়ায় পড়ে রাগ ভুলে তনু অর্থাৎ তনিমাও দিদির সঙ্গে ভাইয়ের পড়ার ঘর সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল! এর পরে মা এক ব্যাপারে বাদ সেধেছিল। একলা তিন তলার ঘরে দীপুকে শুতে দেয়নি। এখনো দেয় না। বয়সে আর মাথায় বেড়ে উঠতে ওর খাট দিদিদের ঘর থেকে সরিয়ে বসার ঘরে আনা হয়েছে। এই ঘরটাও দস্তুর মতো বড়, একদিকে একটা খাট পেতে তার ওপর সুন্দর বেড-কভার বিছিয়ে রাখলে দেখতেও এমন কিছু খারাপ হয় না। কিন্তু দীপুর ইচ্ছে ছিল তিন তলায় সে তার পড়ার ঘরে থাকে। মা-কে অনেক করে বলেছিল, কিন্তু মা কিছুতেই রাজি না। মায়ের চোখে ও এখনো খোকাটি। পনের

ছাড়িয়ে এবার ঘোলয় পড়লেই দীপু যে তার শোবার খাট তিনতলায় ঘরে তুলে নিয়ে আসবে এ সংকল্প একেবারে স্থির।

যাক, তিন বছর আগে তিনতলার নিরিবিলিতে এই বড়সড় পড়ার আর বই সাজানোর ঘরখানা পাওয়ার পর থেকেই ওর নিজস্ব জগতে প্রবেশ। বড়দা ঠাট্টা করে মা-কে বলেছিল, তিন তলায় ঠেলে তুলে তুমি এবার ওকে পাকাপোক্ত জ্যাকি হবার দিকে এগিয়ে দিলে মা।

জ্যাকি ব্যাপারখানা কি মা ততদিনে বুঝে গেছে। সে-রকম সম্ভাবনার কথা ভেবে মা দীপুর দিকেই ফিরে ঝাঁঝালো গলায় বলেছিল, জ্যাকি হয়ে দেখুক না, আমি লক্ষ্য রাখব না ভেবেছিস—আলাদা ঘর পেয়েও পরীক্ষায় এবার প্রথম না হলে কান ধরে আবার হিড়হিড় করে নিচে টেনে নিয়ে আসব—চোখের সামনে দাদাকে দেখেও দাদার মতো হতে ইচ্ছে করে না ?

দীপু রাগবে কি, ওর হাসিই পেয়ে গেছল। মা দাদার থেকে বড় আর কাউকে ভাবতে পারে না। দুনিয়ায় সত্যি যারা বড় তারা যে এক-একজন কি মানুষ মা বেচারি জানবে কি করে। কিন্তু দাদার পরিতুষ্ট মুখ দেখে দীপুর রাগই হয়। মা অমন বলে বলেই দাদাও নিজেকে মস্ত একজন ভাবে।

ওর জ্যাকি নামটা দাদা এরও ছ মাস আগেই চালু করেছিল। অর্থাৎ দীপুর বয়েস তখন পুরো বারোও নয়। ওকে নিয়ে এরও ঢের আগে থেকে সকলেরই একটু মজাদার কৌতূহল ছিল। ওই বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে নিজের মনে থাকে, গভীর মনোযোগে এটা করে ওটা করে—অন্যদের মজা পাবার কথাই। মায়ের পুজোর ফুল এলো। একটা বড় জবা আর একটা বড় গাঁদা ফুল তুলে নিয়ে সেই ন বছরের দীপু কোনো ঘরের কোণে গিয়ে বসল। তারপর প্রথমে গাঁদা ফুলটা ছেঁড়া শুরু হল। ছেঁড়ে আর দেখে ভিতরে কি আছে। এমনি ছিঁড়তে ছিঁড়তে দেখতে দেখতে এত বড় গাঁদা ফুলটা কুটিকুটি হয়ে গেল। শেষে ওর হাতে শুধু গোড়ার বোঁটাটা। তা-ও ছিঁড়ে ছিঁড়ে

দেখা হতে লাগল। ছোট একটা শাঁসের মতো বেরুলো। দু হাতে সেটাকে চটকে গাঁদা ফুলের শেষ পর্যন্ত দেখা হল। এর পর জবা ফুলেরও ওই একই দশা। সামনের লম্বা শুঁড়টা পর্যন্ত বেশ যত্ন করে নখ দিয়ে চিরে চিরে দেখতে বাকি থাকল না।

ওদিকে দিদিরা যে ঠায় দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে ওর কাণ্ড দেখছে খেয়ালও নেই। বড়দি এসে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল, এতক্ষণ বসে বসে কি করলি? ফুল দুটো ওভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কি দেখলি?

—দেখলাম ভিতরে কি আছে।

—কি আছে?

—কিছুই নেই, কেবল পাতা বোঁটা আর একটু শাঁস—জবার শুঁড়ের ভেতরটা একটু অন্যরকম।

দিদিরা বাবা দাদার কাছে ভাইয়ের আধঘণ্টা ধরে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখার গল্প করতে দাদা ওর দিকে চেয়ে থেকে হেসে বলেছিল, ও বোধহয় একদিন নামকরা হরটিকালচারিস্ট হবে।

হরটিকালচারিস্ট কি দীপু জানে না! দিদিরাও মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে যখন তারাও জানে না। ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে মায়ের ভাবনা অন্যরকম। মিটিমিটি হাসতে দেখে মায়ের কথাটার অর্থ ভালো কিছু মনে হয়নি। দাদাকেই জিগ্যেস করেছে, সে আবার কি?

বাবার দিকে চেয়ে দাদা হেসে হেসে বলছে, কি বলব··· উদ্যানপালক?

মা বলে উঠেছে, ও-মা, বাগানের মালি টালি কিছু?

সেই তখন দিদিদের চোখ এড়িয়ে কিছু কি করার উপায় ছিল? বড় পিঁপড়ে মেরে একটা পুরনো ব্লেড দিয়ে কুটকুট করে কেটেছে আর দেখেছে ভিতরে কি আছে। কিন্তু কোথা থেকে কোন দিদি এসে দেখল আর হৈ হৈ করে উঠল। সেবারে খালি বৈঠকখানার বড় সোফার আড়ালে একটা মরা আরশোলা আর ব্লেড নিয়ে নিশ্চিন্ত আর নিবিষ্ট মনে দেখার কাজ সারছিল। আরশোলার পাখা কেটে

দেখা হয়েছে, শুঁড় কেটে দেখা হয়েছে, এবার ওটাকে চিৎ করে বেশ সাবধানে সন্ত পেটটা কেটেছে। দিদি ওকে চমকে দিয়ে ওয়াক ওয়াক করতে করতে ছুটে পালালো। তারপরেই চিৎকার, মা! তোমার ছেলে আরশোলার পেট কেটে দেখছে ভিতরে কি আছে—আমার বমি এসে গেল—শিগগীর গিয়ে তোলো ওকে, ডেটল দিয়ে হাত ধুয়ে দাও!

মা এসে ওকে হ্যাঁচকা টানে তুলেছে। বাথরুমের দিকে টেনে নিয়ে যেতে ধমকেছে ঘেন্নাও করে না তোর—অ্যাঁ?

এরপর দাদা শুনে সেই রকম হুল ফোটানোর মতো করে হেসেছে, আর বলেছে, নাঃ, কালে দিনে ও বোধহয় একজন নামজাদা বায়োলজিস্টই হবে। পরে দীপু ডিকশিনারি খুলে কথাটার অর্থ দেখে নিয়েছিল। মানেটা তেমন খারাপ নয়, জীববিজ্ঞানী। কিন্তু দাদা জানে না, ও এ-সব কিছুই হবে না—ও যা করে তাগিদে আর কৌতূহলে করে।

বইয়ের ওপর ভীষণ টান। ফাঁক পেলে নিজের বই ছেড়ে দিদি বা ছোড়দির বই খুলে বসে। তারা দেখলে আগে ধমক-ধামক করত। কিন্তু বইয়ের বেলায় ভাইয়ের যত্ন দেখে তখন আর কিছু বলত না। সেদিন সন্ধ্যায় দীপু দিদির হাইজিন বইটা খুলে নিবিষ্ট মনে কঙ্কালের ছবিটা দেখছিল। অনিমা ঘরে ঢুকতে তনিমা বলল, আধঘণ্টা ধরে ও ওই কঙ্কাল দেখছে আর অ্যারো দিয়ে দিয়ে যা লেখা আছে পড়ছে।

ধমকের সুরে অনিমা ভাইকে বলল, তোর নিজের পড়া নেই?

—আমার পড়া তো কখন হয়ে গেছে। আচ্ছা দিদি, আমাদের সকলের মধ্যে এমনি করে একটা কঙ্কাল আছে?

—আছে।

—ছেলেদের কঙ্কাল মেয়েদের কঙ্কাল সব একরকম দেখতে? তোমার কঙ্কালও এই রকম?

অনিমা একটু ধমকে জবাব দিল, ওটা পুরুষের কঙ্কাল, মেয়েদের কঙ্কাল আর একটু সুন্দর দেখতে হবার কথা।

—অন্যরকম দেখতে হলে মেয়েদের কঙ্কালের ছবি দেয়নি কেন? নিশ্চয় একরকমই দেখতে।

অনিমা রেগে গিয়ে বলল, থাম। কঙ্কাল আবার কররকম দেখতে হবে? মা খেতে ডাকছে, খেতে যা।

কিন্তু ব্যাপারটা দীপুর মাথায় ঘুরতেই থাকল। তখন বড়খাটে দুই দিদি শোয়, আর কোণের ছোট খাটে দীপু। শুয়ে পড়ার পর জিগ্যেস করল, আচ্ছা দিদি, কঙ্কাল যদি এক-রকম দেখতে, রক্ত মাংস সব থাকলে ছেলে আর মেয়ে অমন আলাদা আলাদা দেখতে হয়ে যায় কি করে?

বিছানায় শুয়ে দুই বোনে হাসি চাপছে। গম্ভীর গলায় দিদির পাল্টা প্রশ্ন, কি আলাদা দেখতে হয়, সবারই মধ্যে তো রক্তমাংস হাড়-গোড়।

—বাঃ তা বলে ছেলে আর মেয়ে কি একরকম দেখতে নাকি! মেয়েদের মুখ অন্যরকম, শরীর অন্যরকম, বুক অন্যরকম—

অনিমার বয়স তখন আঠারো আর তনিমার পনের। দু বোন শব্দ না করে জড়াজড়ি করে হাসছে। ছোড়দি বলল, আমরা জানি না, কাল দাদাকে জিজ্ঞেস করিস।

দিদির গলাও কানে এলো, ছোড়দিকে বলছে, যাঃ, ও সাদা মনে জিগোস করছে, কেন ওকে মার খাওয়াবি!

এরমধ্যে মার খাওয়ার মতো দোষটা কি করল দীপু ভেবে পেল না। ওর জানতে ইচ্ছে করছে বলেই তো জানতে চাইছে। আর শেষে যে প্রশ্নটা দীপু করল তাতে দুই দিদিরই অত হেসে ওঠার কারণটা কি হল ভেবেই পেল না। ও জিগ্যেস করেছিল, আচ্ছা দিদি কেউ ছেলে হয় আর কেউ মেয়ে হয় কেন? সকলেই ছেলে বা সকলেই মেয়ে হয় না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে তুই দিদির অত হাসি শুনে দীপু হকচকিয়ে গেছল। হাসি থামতে ছোড়দি বলে উঠেছিল, হাঁদা কোথাকারের···তাহলে আর স্বস্তি থাকত কি করে!

সঙ্গে সঙ্গে দিদির ধমক।—এই তনু! কি বোঝাচ্ছিস ওকে?

ছোড়দির তবু হি-হি হাসি।—কাল মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করিস!

—না রে দীপু, দিদির এবারে জোরালো নিষেধ, বড় হয়ে সব নিজেই বুঝতে পারবি—কিন্তু খবরদার, মাস্টারমশাইকে বা কাউকে জিগ্যেস করবি না—দু গালে ঠাস ঠাস করে চড় বসিয়ে দেবে তাহলে।

দিদি ছোড়দির থেকে ওকে বেশি ভালোবাসে সন্দেহ নেই। ওকে মারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই নিষেধ করল তা ও বুঝেছে। কিন্তু জানতে দোষটা কি সেটাই শুধু বুঝল না দীপু। দিদি এ-ভাবে বারণ না করলে মাস্টারমশাইকে সত্যিই হয়তো জিগ্যেস করে বসত। তা-ও না পারার ফলে ভিতরের কৌতূহল শুধু জিয়নো থাকল না, বাড়তেই থাকল।

এর পর কোন ছোট মেয়ে চোখে পড়লে খুঁটিয়ে দেখে—সামনে টেনে এনে জামা-কাপড় খুলে যেমন করে পিঁপড়ে কেটে কেটে দেখত, যেমন করে আরশোলা চিরে চিরে দেখত—তেমনি করেই দেখতে ইচ্ছে করত। ছেলেতে মেয়েতে কতটা তফাৎ কেন তফাৎ।

কৌতূহল এমনি দীপুর সর্বব্যাপারে। মায়ের সেলাইয়ের কলটা অনেকদিন লক্ষ্য করেছে। মা যখন হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছু সেলাই করে বেশ দেখতে লাগে। কাপড়ের ধার একটু মুড়ে সেটা ছুঁচের তলায় বসিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই কি সুন্দর সেলাই হয়ে যায়। দীপু কেবল ফাঁক খোঁজে, একদিন না একদিন দেখতেই হবে বুঝতেই হবে ব্যাপারখানা কি। মা ধারে কাছে থাকলে হবে না। দিদিকে শুধু একটু-আধটু হাত দিতে দেয়, তখন পর্যন্ত ছোড়দিকেও মেশিন ধরতে দেয় না।

সুযোগ খুঁজলে আর কে না তা পায়। দীপু অন্তত বরাবরই পেয়ে এসেছে। মা একদিন সবে পুজোয় বসেছে। বেরুতে এক ঘণ্টার ধাক্কা। বাবা ঘরে নেই। দাদার তখন নতুন অফিস। দিদি ছোড়দি চানে ঢুকেছে—দুজনেরই স্কুলের তাড়া। দীপুর কোনো তাড়া নেই—ওর স্কুল এগারোটায়। মওকা বুঝে মায়ের ঘরে ঢুকল। খুব সন্তর্পণে মেশিনের ঢাকনা সরালো। অনেক কাপড়ের টুকরো মেশিনের খুপরির মধ্যেই থাকে দেখে রেখেছে। একটা টুকরো বেছে নিয়ে বসে পড়ল। মায়ের মতো করে টুকরোটার ধার মুড়ল। হ্যাণ্ডেল একটু ঘুরিয়ে কলে আটকানো ছুঁচটা ওপরে তুলে কাপড়ের টুকরোটা গুঁজে দিল। তারপর মেশিন চালিয়েই অস্ফুট আর্তনাদ। ছুঁচটা একটা আঙুলের নখের ওপর দিয়ে মাংস ফুঁড়ে ভেতরে চলে গেছে। যন্ত্রণা চেপে তাড়াতাড়ি গোল রূপোলি চাকতি সামান্য ঘোরাতেই ছুঁচ ওঠার বদলে আরো ডেবে গেল। দীপু ভয়ে আর যন্ত্রণায় নীল, কিন্তু গলা দিয়ে আর এতটুকু শব্দ বার করেনি।

···সেই সময় দিদি কেন একবার মায়ের ঘরে ঢুকেছে সে-ই জানে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখেই তার চক্ষুস্থির। ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠল, মা শিগগীর এসো—দেখো দীপু কি করেছে!

কলটা ঘুরিয়ে দিদিই ছুঁচটা তুলে ওর আঙুল বার করে আনল। মা ততক্ষণে ছুটে এসেছে। খোলা মেশিন আর রক্তাক্ত আঙুল দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। অত যন্ত্রণা হচ্ছে দীপুর, তার মধ্যেই মায়ের হাতের ঠাস করে এক চড়। তারপরেই দিদিকে অকারণ ধমক, দাঁড়িয়ে আছিস কি—বাঁদরটাকে মারতে মারতে শিগগীর নিচের ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যা—ছাখ আছে কি না!

···দোতলার আপদে বিপদে তখন ভরসা একতলার ডাক্তারবাবু—রতনের বাবা। জরুরী কল্ না থাকলে সেটা তার নিচের তলারই চেম্বারে বসে রোগী দেখার সময়। রতনের বাবা চেম্বারে ছিল।

···এতটার পরেও দাদার কাছ থেকে জ্যাকি খেতাব জোটেনি

তার। জুটেছে ওর বয়েস যখন বারো ছুঁই-ছুঁই। তিনতলার নিজস্ব ঘরখানা পাবার মাস ছয় আগে। অবশ্য যে কৌতূহল মেটাতে গিয়ে এই হুলফোটানো খেতাব-লাভ সে-ও ওই তিন তলার ছাদের নিরিবিলি ঘরে বসেই।

ব্যাপার বিশেষ কিছু না, ওদের ক্লাসের বন্ধু শ্যামলের বাবার ছোট-খাট একটা ঘড়ি মেরামতির দোকান আছে। দোকানে ঘড়ি সারাইটাই বড় কাজ, সেই সঙ্গে নতুন পুরনো কিছু ঘড়ি কেনাবেচাও হয়। ফাঁক পেলে শ্যামলের সঙ্গে সেই দোকানে গিয়ে মাঝে মাঝে দীপু ওর বাবার ঘড়ি সারাই দেখে। এই থেকেই মনের তলায় কৌতূহল দানা বেঁধে উঠছিল। শনের মতো ছুঁচলো মুখটা দিয়ে জোড়ার মধ্যে চেপে ধরলেই খুট করে ঘড়ির পিছনের ডালাটা খুলে যায়। তারপর সেই পিছনে কতরকমের সোনালি রঙের খুদে খুদে যন্ত্র। কাচ লাগানো একটা ঠুলির মতো এক চোখে পরে সেই পিছনের দিক দিয়ে ভেতর দেখে তারা। দীপুর ভারী লোভ ওই ঠুলির মতো জিনিসটা চোখে লাগিয়ে ভিতরের সব জিনিসগুলো একবার দেখে নেয়। কিন্তু শ্যামলের বাবাকে তো আর ও-কথা বলা যায় না, হয়তো ধমকেই উঠবে। ছোটদের কত কি জানতে ইচ্ছে করে বড়রা বুঝতেই পারে না।

একদিন শ্যামলকে বলল, তুই আমাকে ওই কাচ লাগানো ঠুলির মতো জিনিসটা ঘণ্টা দুইয়ের জন্য দিতে পারবি—আমি তারপরেই তোকে ফেরৎ দিয়ে যাব।

শ্যামল অবাক, কেন ও-দিয়ে তুই কি করবি?

দীপু অম্লানবদনে বলে বসল, দাদা খোঁজ করছিল, নিজের ঘড়ি তো নিজেই দেখে-ট্যাখে।

শ্যামলের পক্ষে এই আর কঠিন কি। দোকানে কটাই তো আছে। একটা এনে দিল।

তার পরের প্ল্যান দীপুর ছকাই আছে। বাবার টেবিলের ড্রয়ারে

সর্বদাই একটা না একটা রিস্ট ওয়াচ পড়ে থাকে। তার দুটো ঘড়ি। তার মধ্যে একটাই অবশ্য বেশি ব্যবহার করে, অন্যটা মাঝে-সাজে। দীপুর মনে মনে আশা, একটু বড় হলে ওই দ্বিতীয় ঘড়িটা বাবা তাকে দিয়ে দেবে। ও-ঘড়িতে চাবি দেওয়া মায়ের নিত্য কাজ।

—আর শন্ তো একটা মায়ের ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই পড়ে থাকে। দীপু তখনো ওই শনটা দিয়ে মায়ের মাথায় পাঁচটা পাকা চুল তুললে দুটো করে পয়সা পায়। আর ছোড়দি তুললে তিনটেয় এক পয়সা। বড়দি তো কবেই মায়ের পাকা চুল তোলা ছেড়েছে, ছোড়দিরও এখন আর তেমন পয়সা রোজগারের ঝোঁক নেই। মাঝে-সাজে দীপুই যা এক-আধটা ছুটির দিনে তুলতে বসে।

শন্ আর বাবার সেই দ্বিতীয় ঘড়ি তুলে নিয়ে দীপু সোজা তিন-তলায়। ছুটির দিন হলেও বাবা বাড়ি নেই, দাদা বেরিয়েছে কোথায়। বাবার ড্রয়ার খুলে এ-সময়ে কেউ বাবার দ্বিতীয় ঘড়ির খোঁজ করবে না।

···দীপুর প্রথমে এক চোখে ওই ঠুলির মতো জিনিসটা লাগানো রপ্ত করতেই আধঘণ্টা কেটে গেল। যত বার লাগায়, হাত ছাড়লেই খুলে আসে। তারপর এক সময় চোখে আটকে রাখার কায়দাটা বুঝে ফেলল।

এবারে ওটা রেখে বেশ সাবধানে শনটা দিয়ে ঘড়ির ডালাটা খুলতে চেষ্টা করলো। তাও চট করে পারা গেল না, ঘড়িতে আঁচড় পড়ল একটু। খুব সাবধানে সেই দাগ জামায় ঘষে মুছে নিয়ে আবার শন্ লাগালো। বারকয়েক চেষ্টায় ডালা খোলা গেল। ভিতরে সেই ঝকঝকে সোনার মতো যন্ত্রপাতি। ঠুলিটা চোখে লাগিয়ে বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগল।—আঁা কি কচ্ছিস তুই ? বাবার ঘড়ি নিয়ে বসেছিস !

বরাতই মন্দ দীপুর। ও-দিকে ফিরে মেঝেয় মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। ছোড়দি কি শুকোতে দিতে কখন ছাদে উঠেছে টেরও পায়নি। মাঝখান থেকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। দীপ

এমনিই বিষম চমকে উঠেছে যে খোলা-ডালাসুদ্ধ উল্টো মুখ করা ঘড়িটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল—আর সামনের কাঁচটাও ফেটে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ছোড়দি দুপদাপ করে নামতে নামতে চেঁচাতে লাগল, মা! মা—! দীপু কি কাণ্ড করেছে দেখে যাও!

এক মিনিটের মধ্যে দিদি ছুটে এলো। ঘড়ির দশা দেখে সে-ও আঁতকেই উঠল প্রায়। তখন পর্যন্ত খোলা ডালাটা লাগানো হয়নি। গুমগুম করে ওর পিঠে দুটো কিল বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল, এত সাহস তোর অ্যাঁ? বাবা তো তোকে মেরে ফেলবে—পিঠের চামড়া তুলে নেবে!

বাবা গায়ে খুব কমই হাত তোলে। মা বরং সময় অসময়ে এক আধ ঘা বসিয়ে দেয়। তবু দিদিরা বা দীপু সব থেকে বেশি ভয় করে বাবাকে। নিরুপায় রাগে ও বলে উঠল, ছোড়দির জন্যেই তো, নইলে কেউ টেরও পেত না—হঠাৎ পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠে এমন চমকে দিল যে হাত থেকে পড়ে কাচটা ফেটে গেল!

কথা শেষ হতে না হতে দোরগড়ায় দাদা। নেহাত দুর্ভাগ্য না হলে দাদাই বা এর মধ্যে ফিরে আসবে কেন! তবু শাস্তিটা যদি দাদার হাত দিয়ে শেষ হয় মন্দ হয় না। শাস্তি হয়ে গেছে শুনলে বাবা আর খুব বেশি কিছু না-ও বলতে পারে। কিন্তু বাবার চোখে দাদার দেওয়া শাস্তিরও কিছু দাম থাকা সম্ভব। কিন্তু ভাইয়ের টানে দিদিই ঘুরিয়ে বাধ সাধল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, দেখো কি কাণ্ড করেছে—আমি আচ্ছা করে দিয়েছি কয়েক ঘা!

দাদা কথাটি না বলে ঘরে ঢুকল। দু হাত কোমরে তুলে ঘড়ির দশা দেখল। তারপর ওকে। মনে হল দাদার ঠোঁটের কোণে ছুরির ফলার মতো একটু হাসি চিকচিক করছে। ঝুঁকে দিদির হাত থেকে খোলা ডালাসুদ্ধ ঘড়িটা নিল, শনটা আর ঠুলিটা নিল, তারপর বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। দীপু বুঝল, আজ আর রেহাই নেই, দাদাও শাস্তিটা বাবার জন্যেই মুলতবী রেখে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে দিদিই আবার উঠে এলো। খবর দিল কি দীপুর মৃত্যু ঘোষণা করল সেই জানে। দীপুর মনে হল তারও ঠোঁটে চাপা হাসি। না, বাড়ির মধ্যে একমাত্র দিদিরই ওর জন্য যা একটু দরদ আছে ভেবেছিল। চুপি চুপি দিদির কম কাজ করে দেয় দীপু? প্রত্যেকবার দিদি ওকে গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় কাউকে বলবে না— প্রতিজ্ঞা করিয়ে শাসায়, বলে দিলে দিদিকে নাকি ছোট ভাইয়ের পাপ বাঁচানোর জন্যেই মরে যেতে হবে। না আজ তিন মাস ধরে দিদির আর বাসুদার সেই গোপন কাজ করে দিচ্ছে দীপু, কথার খেলাপ কখনো করেনি। ভাই কঠিন শাস্তি পাবে বলে কিনা সেই মুখে আজ চাপা হাসি।

দীপু রাগ করেই উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু দিদি ফিসফিস করে যা বলল, শুনে ওর গা জুড়িয়ে গেল।—শোন্ তোর বজ্জাতির কথা মাস্টারমশাইকে আমি ফোন করে বলে দিয়েছিলাম। আসলে তোকে শাস্তি-টাস্তি যাতে বেশি না দেয় সেই কথা বলেছিলাম। মাস্টারমশাই তো তেমনি চালাক মানুষ, ফিরে ফোন না করে বাড়ির কাছে কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল বোধহয়। বাবা ঢোকার পাঁচ মিনিটের মধ্যে একেবারে দোতলায় এসে হাজির। দাদা তখন বাবাকে ঘড়ি ঠুলি শন্ সব দেখাচ্ছিল। মাস্টারমশাই এসে হেসে হেসে বলল, ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়েছিলাম, ভাবলাম এক পেয়ালা চা খেয়ে যাই।···তারপর তাকে বসিয়ে দাদা বাবা দুজনেই তুই কি করেছিস বলল —শুনে মাস্টারমশাইয়ের সে-কি গলা ফাটিয়ে হাসি রে! চা করতে গেলাম বলে কি কথা হল শুনতে পাইনি। উনি চা খেয়ে চলে যেতে বাবা তোকে ডেকে পাঠালো।···শিগগীর যা, বেশি কিছু বলবে না হয়তো—

হ্যাঁ, মাস্টারমশাই একটা মানুষ বটে, কারো তোয়াক্কা রেখে চলেন না। তাঁর ভাইপোর কাগজের আপিসের চাকরির দৌলতে বাড়িতে একটা ফোনও আছে। দীপু সেই মুহূর্তেই দিদির যেন কেনা হয়ে গেল।

বাবার ঘরের খাটে দাদা বসে। বাবা তার ইজিচেয়ারে। মায়ের মুখ রাগে গনগন করছে। ওদিকে দরজায় ছোড়দি, ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে দীপুর মুখও দেখা গেল।

দীপু এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে বাবার ঠাণ্ডা গলায় হুকুম, মুখ তোল্ !

তুলল।

— এবারের মতো আমি কিছু বললাম না। তুই ভবিষ্যতে ঘড়ির মিস্ত্রি হবি কি মেকানিকাল এনর্জিনিয়ার হবি সেটা আমি এখনই জানতে বুঝতে চাই না। আপাতত মন দিয়ে শুধু স্কুলের পড়া করে যাওয়া ছাড়া আর কিছু আমি চাই না। স্কুলের পর কলেজের পড়া। তারপর যে কোনো বিষয়ে দিগগজ হতে চাইলে কিছু বলব না। কিন্তু তার আগে এ-রকম সাহস বরদাস্ত করব না —মনে থাকবে ?

দীপু কাঁধে ঘাড় ঠেকিয়ে মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

চলে যাবার আগেই দাদা ধমকে থামালো—শোন !

দাঁড়িয়ে গেল। দাদার ঠোঁটের কোণে সেইরকম ছুরির ফলার মতো ছুঁচলো হাসি। বলল, মা ভেবে পাচ্ছিল না ভবিষ্যতে তুই কি হবি—আমি বললাম, জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান্। মা ঠিক বুঝল না কি হবি। · তুই বুঝেছিস ?

দীপু ঘাড় নাড়ল। বুঝেছে।

—মা-কে বলে দে !

দীপু চুপ। বাবার ঠোঁটেও হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু দাদা হঠাৎ যেন নির্মম। ডবল ধমকে উঠল—বলে দে !

দীপু মিনমিন করে জবাব দিল, সবেতে মাঝারি। পটু কিছুতে নয়।

দাদা ফের ধমকে উঠল, ওটা একটা বাংলা হল ? আসল মানে, সবেতে গাধা, ঘোড়া কিছুতে নয়—সবেতে গোলাম, টেক্কা কিছুতে নয়—সবেতে বেড়াল, বাঘ কিছুতে নয়—বুঝেছিস ?

সেই থেকে দীপু জ্যাকি। আগে দাদা বউদি বা কেউ জ্যাকি বলে হাঁক দিলে দারুণ রাগ হত। এই তিন বছরের ওপর শুনতে শুনতে কানে সয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এরপর মজার চিন্তাও মাথায় এসেছে। মাস্টারমশায়ের কথা যদি ঠিক হয়, ও যদি দেশের দশজনের একজন হয়েই ওঠে ,এমন নাম দেওয়ার জন্য দাদাই সব থেকে লজ্জা পাবে। সকলের মুখ আলো করে ও যখন বিদেশে যাবে, সেখান থেকে দাদার কাছে চিঠির শেষে নিজের নাম লিখবে না— লিখবে, তোমাদের জ্যাকি।

তিনতলার ঘরে দীপুর নিজস্ব জগৎ রচনার কাজে তাকে সব থেকে বেশি এগিয়ে দিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। প্রথম দিন এই তিনতলার ঘরে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে বলে উঠেছিলেন, বাঃ! ঘর দেখে আর বই সাজানো দেখে ভারী খুশি। ডগমগ স্বরে বলেছিলেন, সব সাধনা আর সমস্ত সিদ্ধির জন্য আসন চাই—বুঝলি? এই ঘরটা হল তোর আসন। আচ্ছা এবারে আলোটা নিভিয়ে দে তো—

দীপু কিছু না বুঝেই ঘরের জোরালো আলো নিভিয়েছে।

অন্ধকারে মাস্টারমশাইয়েব গলায় যেন কৌতুক ঝরছে।—কি দেখছিস এখন?

—কিছু না, কেবল অন্ধকার।

—আচ্ছা এবার আলোটা জ্বাল্।

আলো জ্বালাল।

—এখন কি দেখছিস?

—সব। ঘর, বই-পত্র, আপনাকে···

—তাহলে এক-ঘর ঠাসা অন্ধকার গেল কোথায়?

—আলো জ্বাললে অন্ধকার থাকবে কি করে?

যেন খুব একটা শক্ত প্রশ্নের জবাব ঠিক হয়েছে, মাস্টারমশাই

এমনি খুশি।—দারুণ বলেছিস, আলো জ্বালালে অন্ধকার থাকে না। মানুষের ভিতরের আসল আলো হল জ্ঞান—বুঝলি! জ্ঞানের আলোটি জ্বলল তো সব অন্ধকার কুপোকাত! আর যতক্ষণ না জ্বলছে এই অন্ধকারে হাতড়ে মরা।

মাস্টারমশাই এমন সহজ করে সব-কিছু বলেন যে তাইতেই মনে হয় ভিতরের খানিকটা অন্ধকার সরে গেল। এই মাস্টারমশাই একদিন পড়াতে পড়াতে মায়ের কথা বলছিলেন। দীপুর মা শুধু নয়, পৃথিবীর সকলের মায়ের কথা।—মা বড় সাংঘাতিক চিজ্ বুঝলি, মা-কে অমান্য করলে বা ভাল না বাসলে অতি বড় সাধকেরও সাধনা হয় না—মা অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত নিমাইয়ের মতো পণ্ডিত ঘর ছাড়তে পারেনি, বামাক্ষ্যাপার মতো সাধকের হাঁসফাঁস দশা। মায়ের অনুমতি ছাড়া বড়মায়ের কোল পাবে না এটা ঠিক বুঝেছিল। বিদ্যাসাগর অত বড় দামোদরখানা মা-মা করে পার হয়ে গেল—বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে গুরুদাস সেই বাচ্চা বয়সে 'ক' লিখতে না পারা পর্যন্ত মা তাকে খেতে দিল না—নিজেও উপোস। ভালোমতো 'ক' লেখা হল তবে খাওয়া জুটল—অমন মা পিছনে না থাকলে গুরুদাস স্যার গুরুদাস হতে পারত?

দীপুর ভাবতে ভালো লাগত ওই-সব মায়ের মতোই একজন তারও মা। নিজের এই মায়ের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক সময় চোখে পড়ে বটে, কিন্তু মনে মনে দীপু যেন স্থির জানে ওই সব অসামান্য লোকদের মায়ের সঙ্গে তারও মায়ের আসল চেহারাটির খুব তফাৎ নেই।

...কিন্তু আজ দীপু ভিতরে ভিতরে অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে গেছে। মায়ের ভিতরের সেই কল্পনার রূপ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। রতনরা চলে গেল...চলে গেল কেন, বলতে গেলে ওদের তাড়িয়েই দেওয়া হল। বাবার মতো দাদার মতো মা-ও এখন মাসে পাঁচশ টাকা ভাড়ার কথা ভাবছে। ছ হাজার টাকা সেলামীর কথা ভাবছে!

॥ তিন ॥

···বাড়ির মধ্যে ছোট ভাইয়ের জন্য দরদ একটু আছে কেবল দিদির। ছোড়দিটার মতো নয়। দিদি যতটা পারে ওকে আগলে রাখে, বাবা-দাদার ধমক-ধামক থেকে ওকে বাঁচায়। রতনরা চলে যাবার তিন সপ্তাহের মধ্যে এই দিদিকে নিয়েই বাড়িতে একটা ওলট-পালট কাণ্ড হয়ে গেল। ব্যাপার দিদিকে নিয়ে। দিদিকে সকলে সুস্থির বুদ্ধিমতী মেয়ে ভাবত। বাবা মা এমন কি দাদারও সবেতে ছোড়দির থেকে দিদির ওপরে বেশি আস্থা ছিল। সেই দিদি যেন আচমকা সকলের সঙ্গে বিষম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে, এমনি ভাব সকলের। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে মুখ চুন করে দিদি তার ঘরে সেঁধিয়েছে। বাবা-মায়ের চিৎকার চেঁচামেচি গালাগালি তার কানে এসেছে। দীপু ঘরের কোণে বসে দিদিকে কাঁদতে পর্যন্ত দেখেছে। তাতে বাড়ির সকলের মধ্যে কেবল যেন দীপুর বুকের তলাতেই মোচড় পড়েছে, আর কারো নয়। শুধু ছোড়দিকে কেবল নিষ্ঠুর মনে হয়নি। ও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ মেরে গেছে। আর গলাবাজি করেনি কেবল দাদা। কিন্তু তার ভারিক্কি চালের ঠোঁট সেলাই করে থাকাটা বাবা মায়ের গালাগালি থেকেও বেশী নির্দয় মনে হয়েছে দীপুর। বাড়ির হাল যা, তাতে দাদা যেন এর থেকেও ঢের বেশি দেখার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু বউদি মুখ চাপা দিয়ে থাকেনি। দাদাকে যা বলেছে, দীপু বাইরের বারান্দা থেকে নিজের কানে শুনেছে। আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনাটা দীপু নিজেও নিন্দেরই মনে করে। কিন্তু দিদির ওপর

যেখানে এমন অত্যাচার সেখানে সকলের মনোভাব বোঝাটা দীপু দরকার মনে করে। তাই বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গম্ভীর মুখে দাদা যখন নিজের ঘরে ঢুকে গেল, দীপুও তখন সে ঘরের পর্দার পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছিল। বউদির জলবিছুটি ছড়ানো গলাও কানে এসেছে। দাদাকে বলছিল, লেখা-পড়া জানা বিদুষী মেয়ে একটু প্রেমও করবে না? তোমরা এত আশা করো কি করে?

দাদার জবাব, লেখা-পড়া তো কিছু তুমিও করেছিলে।

বউদির উত্তর, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি কি তোমার বোনেদের মতো অত আধুনিক!

পর্দার আড়ালে থেকে দীপু বউদিকে জিভ ভেংচেছে। ইচ্ছে করেছে ঘরে ঢুকে গিয়ে বলে তুমি দিদির পায়ের নখের যুগ্যিও নও।

যাক, নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকেই দীপু সব থেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছে। শুধু বাবা নয়, শুধু দাদা বউদি নয়···তাদের সঙ্গে মায়েরও যে স্বার্থের চেহারাটা দেখল দীপু, সেটাই সব থেকে বড় আঘাত।

আজ তিন বছরের ওপর হয়ে গেল দিদির সঙ্গে রায় বাড়ির বাসুদার কিছু একটা ব্যাপার চলছে সেটা দীপুই সব থেকে আগে জেনেছে। রায়-বাড়ি বলতে ওই সামনের মোড় ঘুরলে ছোট ছাল-বাকল ওঠা পুরনো একতলা বাড়ির ছেলে বসন্ত রায়। ব্যাপারখানা দীপু আগে বোঝেনি। বয়েস একটু বাড়তে আবার বুঝতে কিছু বাকিও থাকেনি। তবু দিদির কাছে না বোঝার ভান করেই কাটিয়ে দিয়েছে। যখন একটা মুখের কথাও হয়নি তখন থেকেই বাসুদাকে বেশ ভালো লাগত দীপুর। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, হাসি হাসি মুখ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মনে হত দু চোখ দিয়ে বুদ্ধি উপচে উঠছে। ওকে দেখলে বাসুদা বেশ মিষ্টি করে হাসত কেন দীপু তা-ও বুঝত না। ওই রায় বাড়ির পাশের বাড়িতে ওদের ক্লাসের কমল বলেছিল. বাসুদা দারুণ স্কলার—আর কি-যে ভালো! ওর বাবা মাস্টার

রাখতে পারে না বলে শনি রোববারে বাসুদা নিজে কমলকে ডেকে নিয়ে পড়ায়, আর কি সুন্দর করে সব বুঝিয়ে দেয়।

…তাই দিদির সঙ্গে ব্যাপার কিছু আছে বোঝার আগেই বাসুদাকে দীপুর ভালো লাগত। পরে হঠাৎ একদিন বিকেলে দেখল হাজরার দিক থেকে দিদি আর বাসুদা বেশ হাসি মুখে গল্প করতে করতে আসছে। ওকে দেখেই দিদি ছিটকে সরে গেল কেন দীপু ভেবে পায়নি। সেই সন্ধ্যাতেই দিদি ওকে দারুণ একখানা চকোলেট এনে দিল। তারপর আদর করে জিজ্ঞেস করল, আমার সঙ্গে বিকেলে ওই যে ভদ্রলোককে কথা কইতে দেখলি তাকে তুই চিনিস শুনলাম?

—না চেনার কি? বাসুদা। কমল বলছিল দারুণ স্কলার।

—তাই তো, দিদির আগ্রহ বাড়ল, ওঁর কাছ থেকে আমি পড়াশুনার ব্যাপারে একটু-আধটু সাহায্য নিই—তুই কিন্তু কাউকে বলবি না, তনুকেও না—এই আমার গা ছুঁয়ে বল্—বলবি না তো?

দীপু কথা দিল কাউকে বলবে না। কিন্তু পড়াশুনার ব্যাপারে কারো সাহায্য নেওয়াটা দোষের কি ভেবে পেল না। এর দিনকতক বাদে দিদি হঠাৎ একদিন ওকে ডেকে বলল, তোর বাসুদার খুব জ্বর হয়েছে শুনলাম, চুপি চুপি একবার দেখে আয় না—আর এই চিঠিটা তার হাতে দিবি আর কারুর হাতে না। যদি শরীর ভালো থাকে আমার পড়ার একটা প্রশ্নের উত্তর লিখে দেবে। খুব সাবধান, কাউকে বলবি না! কেমন আছে না আছে যদি একটু লিখে দেয় তো কেউ যেন জানতে না পারে—আমিই তোর কাছ থেকে চেয়ে নেব, তোকে এনে দিতে হবে না। বুঝলি তো?

দীপু সানন্দেই খাম প্যাণ্টের পকেটে পুরে চলে গেছল। বাসুদা যে ওকে এত আদর যত্ন করবে ভাবতেই পারেনি। একেবারে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। জ্বরের খবর জিগ্যেস করতে বার কয়েক জোরে নাক টেনে বলেছিল, জ্বরটা নেমে গেছে, তবে সর্দি এখনো

আছে। দীপুকে সেই প্রথম দিন চার-চারটে বড় রসগোল্লা এনে খাইয়েছে। আর হেসে হেসে বলেছে, তুমি অনেক কিছু জানো— কালে দিনে তুমি মস্ত একজন হবে। তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে তোমার দিদি ঠিক বলেছে। ওঠার আগে বাসুদা বলেছে, তোমার যখন ইচ্ছে হবে চলে এসো, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে··আর ভালো কথা .তামার দিদির পড়ার প্রশ্নের উত্তরটা লিখে দিই, দিদি ছাড়া আর কারো হাতে দেবে না—

উত্তর লিখতে বাসুদার তিন মিনিটও লাগল না। তা-ও খামে পুরে মুখ বন্ধ করল।

সেই বিকেলেই যে বাড়িতে কিছু ব্যাপার আছে দীপু জানতই না। দুপুরের পরে টের পেল। বিকেলে দিদিকে কারা দেখতে আসছে। বাড়ির সকলেই ব্যস্ত। শুধু দিদির মুখ ভার। দীপু ভাবল, বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হবে এ-জন্যেই দিদির মন খারাপ। সেই সম্ভাবনার কথা ভাবতে দীপুরও ভালো লাগেনি। কিন্তু সেই লোকেরা খেয়েদেযে দিদিকে দেখে চলে যাবার পরে বাবার কি রাগ! রাগের কারণ দীপুও জানে। দিদিকে যখন দেখানো হচ্ছিল দীপুও তো সেই ঘরের জানলাতেই দাঁড়িয়েছিল। ঘরে ঢুকে দিদি যেন একবারে বোবা বনে গেছল। মা পইপই করে শিখিয়ে দিয়েছিল, ঘরে ঢুকে বয়স্ক যারা আসবে তাদের যেন প্রণাম করে। নাভাস হয়ে দিদি কিছুই করল না, হাত দুটো পর্যন্ত তুলে কপালে ঠেকালো না। তিনবার করে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা বসতে বলার পর বসেই দিদি সেই যে মাথা গোঁজ করল, আর তুললই না প্রায়। তারপর একে একে কত কি জিগ্যেস করতে লাগল তারা—পড়াশুনার কথা, গান-বাজনার কথা, রান্না-বান্না সেলাই ফোঁড়াইয়ের কথা—দিদির মুখে জবাব নেই, একেবারে বোবা। এক-এক কথা তিন বার করে বললে বড় জোর একটু মাথা নাড়ে।

দিদি দেখতে খারাপ নয়। ছোড়দির থেকে অন্তত ঢের ভালো।

কিন্তু পছন্দ যে হল না সেটা দীপু পর্যন্ত তাদের মুখ দেখে বুঝে ফেলেছিল। কিন্তু অবাক দীপুও কম হয়নি। দিদিটা তো কখনো এমন ভোঁতা-মার্কা মেয়ে নয়। হঠাৎ এত নার্ভাস হয়ে গেল কেন! যারা দেখতে বসেছিল দিদিকে তারা কি ভেবে গেল চিন্তা করেই দীপুর বেশি খারাপ লাগছিল।

সেই লোকেরা চলে যেতে বাবা মায়ের ওপরেই ফেটে পড়ল একেবারে।—তোমার মেয়েকে ওরা একটা রক্তমাংসের পুঁটলি ভেবে গেল বুঝলে? কলেজে পড়ছে না ছাই করছে—মেয়ে দেখানোর আগে শেখাও ভালো করে—শেখাও! যত গলা সব বাড়িতে—

এর মাস দুই আগে দাদার বিয়ে হয়েছিল। দীপু নিজের কানে শুনেছে, বউদি দাদাকে বলছে, সত্যি একেবারে গেঁয়ো ভেবে গেল অনুটাকে—আজকালকার দিনের মেয়ে এত নার্ভাসও হয়!

...দিদি এরপর মাকে বলে দিয়েছিল, বি-এ পাশ করার আগে তার বিয়ের কথা যেন না ওঠে। তাই শুনেও বাবার রাগ। কিন্তু যা-ই হোক দিন গড়িয়ে গেছে। দিদি বি-এ পাশ করেছে। ততদিনে দীপু সবই বুঝে ফেলেছে। আর তারপর তার দারুণ ভালো লেগেছে। বাসুদা সত্যি বড় ভালো। দিদি আর বাসুদার মাঝখানে দীপু যেন ভারী নির্ভরযোগ্য সেতু একখানা।...সেই যে দিদি ওকে গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল এ-ব্যাপার কাউকে বলবে না—বলে দিলে ছোটভাইয়ের পাপ বাঁচানোর জন্যেই দিদিকে মরে যেতে হবে—এখনো সেই একই ব্যাপার চলছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা না করালেও দীপু কাউকে বলত না। বরং মাঝে মাঝে চিন্তা হত, বাবার মেজাজ ঠাণ্ডা করে দিদি বাসুদাকে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করবে কি করে। ছোড়দিটা এর মধ্যে সব জেনে ফেলেছে—এ তার চোখ দেখেই বোঝা যায়। হয়তো দিদিই বিশ্বাস করে ছোড়দিকে বলেছে।

বি-এ পাশের পরেও এক-দেড় বছর গড়িয়ে গেল। দিদির বয়েস এখন বাইশ। বাবারও সমান তালে মেজাজ চড়ছিল। ডাক্তার

ছেলের সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে দিদি মায়ের মারফৎ জানিয়ে দেয় ডাক্তার বিয়ে করবে না। উকিল ছেলে ঠিক করলে বলে দেয়, উকিল দু চক্ষে দেখতে পারে না। মেয়ে এরকম বলতে পারে বাবার কল্পনার বাইরে। শেষে একজন এনজিনিয়ার ছেলে ঠিক হল, দিদির এনজিনিয়ারেও আপত্তি। দাদা এনজিনিয়ার—তাই এই আপত্তির কথা শুনে বউদি পর্যন্ত ঠেস দিতে ছাড়ল না। বাবা ক্ষেপে গিয়ে দিদিকেই ডাকল।—কি চাই তোর? ডাক্তার না উকিল না এনজিনিয়ার না—তাহলে কি-রকম ছেলে পছন্দ তোর? চুপ করে থাকলে চলবে না! এ-সব কথা কোনো বাবাকে জিগ্যেস করতে হয় না—আমায় হচ্ছে! আমি জানতে চাই কি-রকম ছেলে পছন্দ তোর?

ভয়ে দিদির মুখ আমসি। দাদা তাকে একটু সাহস দিল। বলল, তোর নিজের যখন একটা পছন্দ অপছন্দ আছে, তখন সেটা খোলাখুলি না বললে হবে কি করে?

দিদি বিড় বিড় করে জবাব দিয়েছে, মা-কে বলব···

বলেছে। তারপর এই অশান্তি।

মায়ের এমন গলা এমন সব কথা কি কেউ জীবনে শুনেছে?—মর —মর—এমন কথাও শুনতে হল আমাকে—তার আগে মরতে পারলি না!···কলেজের মাস্টার—নিজে ভালো খেতে পরতে পায় কিনা ঠিক নেই—তোকে সুখে রাখবে? তার ওপর এত সাহস তোর যে জাত-বর্ণের মধ্যে নয় জেনেও তুই এগোলি?

বাসুদা কলেজে মাস্টারি করছে দীপু জানত, কিন্তু রায় পদবীটা জাত-বর্ণের মধ্যে নয় কেন ভেবে পায়নি। পরে ছোড়দির কাছে শুনেছে রায় বামুন তারা।

দিদি কেঁদে কেটে সারা। দাদা বউদি দিদিকে বোঝানোটা কর্তব্য মনে করেছে। তনু মানে ছোড়দির বিয়ের কথা ভাবতে বলেছে—তার ওপর বাড়ি ঘরের ওই অবস্থা, তাছাড়া কলেজের মাস্টারের যা

মাইনে তাতে এ-বাড়ির মেয়ের তিন মাসের মধ্যে সব মোহ কেটে যাবে—তা-ও বলতে ছাড়েনি। এর জবাবে দিদি বলেছিল, ও পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করলে অবস্থা খারাপ থাকবে না···

কি পরীক্ষা দাদা শোনেওনি। বাবার কাছে গিয়ে রাগ করেই বলেছে, নাঃ ইমপসিবল!

বাবা গর্জন করে উঠেছে। চিৎকার করে মা-কে বলেছে, ওকে বাড়ি থেকে বার করে দাও। বেরিয়ে গিয়ে যেখানে খুশি বিয়ে করুক—আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না—এ সবে আমি প্রশ্রয় দেব এত দুর্বল বাপ আমি নই এ-যেন খুব ভালো করে জেনে রাখে!

দিদির কান্না দেখে দীপু এমন অস্থির হয়ে পড়ল যে শেষে মা-কেই না বলে পারল না—তোমরা এমন করছ কেন, বাসুদা তো খুব ভালো লোক···।

মা ফুঁসে উঠল।—ও···! তলায় তলায় ও তোর মাথাটাও খেয়েছে তাহলে? ঠাস ঠাস করে পিঠে এলোপাথাড়ি কয়েকটা চড় বসিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিতে দিতে মা বলল, বেরো এখান থেকে—যত সব অজাত এসে ঠাঁই নিয়েছে এখানে।

একটা করে দিন যায় আর বাড়ির হাওয়ার গুমট বাড়ে। রাতে দাদা আগের মতোই বাবার ঘরে গিয়ে বসে—ঘরের দরজা এখন আর সব-দিন বন্ধও থাকে না। মদ খেতে খেতে দুজনেরই তপ্ত কথাবার্তা শোনা যায়। হয় দিদিকে বকছে নয়তো মা-কে। মা চোখ রাখেনি বলেই নাকি এমনটা হয়েছে। মা নিজেই জ্বলছে। চুপ করে থাকতে পারে না—রাগ করে, চেঁচামেচি করে। তারপর সেই রাগ দীপু আর ছোড়দির ওপরে ঝাড়ে। দিদির সঙ্গে তো কথাই বন্ধ।

কান্না বন্ধ করে দিদি একেবারে গুম হয়ে আছে এখন। থমথমে মুখ। কেবল ওকে ডেকে বাসুদার কাছে খামে চিঠি পাঠায়। এখন আর কাউকে না বলার দিব্যি দেয় না। দীপুর এখন কেমন ভয় ভয়ই করে। মনে হয় শিগগীরই কিছু একটা ঘটবে।

ঘটল। এক বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে দিদি বাড়ি নেই। ওপরে না নিচে না ছাদে না—কোথাও না। নিচের তলার ভাড়াটে তখনো আসেনি। মিস্ত্রিরা কাজে লেগে একতলার ভোল পাল্টে দিচ্ছে। ওখানে সেই বড়লোক ভাড়াটের আসাই ঠিক। বাবা দাদার মুখ এমন থমথমে যে তাকাতে ভয় করে। মায়ের মুখ পাথর। ছোড়দিকে ইশারা করে দীপু ছাদের ঘরে চলে গেল। আগেও মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ও এ-ঘরের চৌকিতে বসে পড়ত। রতনরা চলে যাওয়ার পর রাতে এই ঘরেই শোয়।

ছোড়দি এক ফাঁকে উঠে এসে জানিয়ে গেল. আজ দিদির রেজিস্ট্রি বিয়ে। দিদি তোকে আর আমাকে রাতে বাসুদার ওখানে যেতে বলে গেছে। কিন্তু আমার অত সাহস নেই বাপু, বাবা জানলে খেয়ে ফেলবে।

জানলে বাবা আস্ত রাখবে না এ কি দীপুর জানা নেই? কিন্তু যত বেলা বাড়ছে ততো ছটফটানি। এমন কি স্কুলে পর্যন্ত মন টিকল না।

···দীপু রাতে গেছে। দিদির দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারেনি। বিয়ে হলে মেয়েরা একবেলার মধ্যে এমন বদলে যায়! কি সুন্দর লাগছে দিদিকে দেখতে! হালকা নীল বেনারসী শাড়ি ব্লাউজ পরেছে, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর—এক গা গয়না। এমন সব মেয়ে এসেছে, তাদের দীপু চেনে না। তারা দিদিকে ঘিরে বসে আছে।

এর পরেই ভ্যাবাচ্যাকা খাবার পালা। দিদি ওকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেলল। ফলে দীপুরও কান্না পাচ্ছে। বলল, দিদি তুমি কেঁদ না।

দিদি তবু কাঁদে।

ওদিকে বাসুদা খুব খুশি। ওকে একগাদা খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। তারপর দিদিকে বলল, দীপুবাবুকে তোমার ঘর দেখাও— সেখানে বসে ওর সঙ্গে গল্প করো।

চালাক বটে বাসুদা।

বাড়ির বাইরেটা এমন, কিন্তু ভিতরটা সুন্দর। বাসুদার ঘরটা দুই একদিনের মধ্যেই বিশেষ করে সাজানো হয়েছে। নতুন খাট ড্রেসিং টেবিল এসেছে। একটা নতুন আলমারিও। কৌতূহল চাপতে না পেরে দীপু জিগ্যেস করল, বাবা তো কিছুই দেয় নি, ছোড়দি বলল তুমি এককাপড়ে বেরিয়ে এসেছ—এত গয়না কে দিল ?

দিদির মুখে এবার একটু হাসি ফুটল। এ-সব আমার জন্যে আমার শাশুড়ির তোলা ছিল। আজ বিয়ের পর তোর বাসুদা বার করে দিয়েছে।

দীপু খুশি যতো, অবাকও ততো। দিদি যেন একটা দিনের ক'ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে এ বাড়ির লোক হয়ে গেছে।

দিদি জিজ্ঞেস করল, তনু এলো না ?

—বাবার ভয়ে এলো না।

দিদির ওর জন্যেও ভাবনা ধরে গেল।—জানলে তোকেও তো বকবে !

দিদিকে দেখে এখন দীপু এত খুশি যে নিঃশঙ্কে বলল, বয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে দোতলার সিঁড়ির মুখেই ধরা পড়ল। ধরার জন্য বাবা তৈরিই ছিল বোঝা গেল! বাবার পিছনে দাদা। গলার স্বরেই বাবার মেজাজ বোঝা গেল।—কোথায় গেছলি ?

বাসুদার বাড়ি বলতে গিয়েও দীপুর কি মাথায় এলো। বলল, দিদির বাড়ি।

বাবা সেই সিঁড়ির বারান্দাতেই ওকে টেনে তুলে পা থেকে চটি খুলে নিয়ে ক'ঘা বসিয়ে দিল। দীপুর মনে হল জামার তলা দিয়ে গায়ের চামড়া ফেটে ফেটে যাচ্ছে। মারের সঙ্গে সঙ্গে বাবার হুংকার। —আমাকে অপমান করিস, বাড়ির লোককে অপমান করিস—এত সাহস তোর।

ও-দিকে নিজের ঘরের দরজার আড়ালে ছেলে-কোলে বউদি দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ সবাই ওর ফেরার আর শাস্তি দেখার অপেক্ষায় ছিল।

রাগে কি পরিশ্রমে কে জানে, বাবা হাঁপাচ্ছে। আর আশ্চর্য, দীপু এত যে ভয় করত বাবাকে, এই এক শাসনেই সব ভয়-ডর যেন উবে গেল। মার শেষ হতে সোজা তিনতলায় উঠে গেল। পিছন থেকে দাদার গলা কানে এলো, ইম্পারটিনেণ্ট!

এত মারের পরেও দীপু একটু আ-উ করল না, সোজা তিনতলায় চলল এটাই হয়তো দাদার রাগের কারণ। দীপু ঘরে এসে আলো জ্বালল। মনে মনে ও এটাকে শান্তির ঘর বলে। এ-ঘরের সব বইপত্রগুলো ওর বন্ধুর মতো। যেন ওর অপেক্ষায় বসে থাকে। অনেকদিন কোনটার দিকে না তাকালেও অভিমান নেই। টেনে নিলেই ভারি আপনার। খুললে কিছু না কিছু ওরা দেবেই দীপুকে। কিন্তু আজ ওরাও যেন অনেকটা নিঃস্ব হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। দীপুর এই যন্ত্রণা হাল্কা করার মতো ওদের কিছু নেই। যন্ত্রণাটা জুতোর মারের নয়। সেই রতন চলে যাবার পর থেকেই বাবা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে টান ধরছিল। যা-ও ছিল তার অনেকটাই আজ চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে ছোড়দি উঠে এলো। শুকনো মুখে বলল, দীপু, বিশ্বাস কর্, আমি কাউকে কিচ্ছু বলিনি—দাদার কেমন সন্দেহ হতে আমাকে ডেকে জেরা করতে লাগল। তাইতে আমি শুধু বলেছিলাম, দিদি তোকে আর আমাকে রাতে যেতে বলে গেছল। বলেছি, তুই গেছিস কিনা আমি জানি না।

ছোড়দির এই ভয়ার্ত মুখ দেখেই দীপুর রাগ হচ্ছিল।—তুই তো জানতিস আমি গেছি, মিথ্যে কথা বলতে গেলি কেন?

ছোড়দি হকচকিয়ে গেল একটু।—বা রে, আমি আগ বাড়িয়ে বলে দেব তুই দিদির ওখানে গেছিস!

—তনু ! নিচের সিঁড়ির কাছ থেকে দাদার হাঁক শোনা গেল।

ছোড়দি তাড়াতাড়ি বলল, খেতে চল শিগগীর—না হলে বাবা আরো রেগে যাবে।

দীপু জবাব দিল, বলে দিস আমি দিদির ওখান থেকে খেয়ে এসেছি—খাব না।

চার বছরের ছোট ভাইয়ের এত সাহস দেখে তনিমা দস্তুরমতো অবাক।

বাবা মায়ের প্রতি দীপুর শ্রদ্ধাভক্তি আরো একপ্রস্থ ঝাঁঝরা হয়ে গেল মাস তিনেকের মধ্যেই। সেটা পরে অনুভব করেছিল। তার আগে সেদিনের খবরের কাগজ খুলেই উৎকট রকমের আনন্দ হয়েছিল। আর দাদা বউদির মুখখানাই ওর বার বার দেখার বস্তু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাবা মায়ের ভোলও যে এমন চটপট বদলাতে পারে কল্পনা করেনি। এই দু মাসের মধ্যে বাবা ছোড়দির বিয়েটা চটপট দিয়ে ফেলার চেষ্টায় ছিল, আর মা তার সঙ্গে তাল দিয়ে চলছিল. দিদির এই ব্যাপার হওয়াতে ছোড়দির ওপর মা কড়া নজর রেখে চলছিল। ছোড়দিও যে খুব চুপি চুপি দিদির সঙ্গে দেখা করে দীপু সেটা বাবার হাতে মার খাওয়ার সাত দিনের মধ্যে বুঝে ফেলেছিল। কারণ, সাতদিন পরে স্কুল ফেরত দীপু আবার বাসুদার বাড়িতে ঢুকেছিল। বাসুদা তখন ছিল না। ওকে দেখে দিদির চোখে জল টলটল করছিল। বলেছিল, কেন এলি, জানতে পারলেই তো আবার মার খাবি !

দীপু বলেছিল, জানতে পারবে না, পারলেও মারবে না-হয়, আমি আর কাউকে ভয় করি না। বাবা মা-ই আমার ভয়-ডর কেড়ে নিয়েছে।

যাক, ছোড়দি যে আসে দীপু সেটা বুঝে নিয়েছিল। নইলে দিদি মায়ের খবর জানবে কি করে।

···ছোড়দি দেখতে দিদির থেকে খারাপ। তা বলে কুৎসিত নয়। কিন্তু দেখেই পছন্দ হবারও নয় বোধহয়। কারণ, দিদির বিয়ের এই তিন মাসের মধ্যে দু দল ছোড়দিকে দেখে গেল। শেষ পর্যন্ত দীপু বুঝে নিল ওদের পছন্দ হয়নি। ছোড়দি এখন ফাঁক পেলে তিনতলায় দীপুর ঘরে উঠে আসে। এই ক মাসের মধ্যেই কেন যেন চার বছরের ছোট ভাইটাকে তনিমার আর অত ছোট মনে হয় না। ওর ভিতরে যেন একটু ঠাণ্ডা গোছের শক্তি আছে ভাবে। বলে, বাসুদার মতো লোক হয় না বুঝলি—দিদি খুব ভালো কাজ করেছে—কিন্তু সেই রাগে বাবা যে আমাকে ঝটপট কার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেবে কে জানে! মা-কে প্রায়ই শোনায়, যে স্বভাব চরিত্র এ-বাড়ির মেয়ের, বেশিদিন ঘরে রেখে আর আস্কারা দেওয়া নয়, মোটামুটি একজনকে পেলেই পার করে দেবে। দিদি তেমন লোক পেয়েছে বলেই চলে গেছে, আমাকে না গলায় দড়ি দিতে হয়। মা-ও এখন আর আমাকে বিশ্বাস করে না বুঝলি, দু-পাঁচ মিনিট কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হলে জেরা শুরু করে···।

বাড়ির এই অবস্থার মধ্যে সেই চমক। ইংরেজি বাংলা দুটো কাগজেরই প্রথম পাতায় বাসুদার ছবি। আই এ এস পরীক্ষায় তৃতীয় হয়েছে—অল ইণ্ডিয়ার পরীক্ষায় মাত্র সতেরজন উতরেছে, তার মধ্যে তিন নম্বর নাম বাসুদার—আর বাঙালী মাত্র ওই একজন। দীপুর তক্ষুনি মনে পড়ল, দিদি দাদাকে বলেছিল বটে, পরীক্ষা দিয়েছে পাশ করলে অবস্থা খারাপ থাকবে না। দিদির সে কথায় কেউ কানও দেয়নি। কি পরীক্ষা তা-ত জানতে চায়ইনি।

দীপু আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। ছুটে নেমে গিয়ে আরো দুখানা কাগজ কিনে নিয়ে এলো। তারও প্রথম পাতায় বাসুদার ছবি। ওই কাগজ দুটো দাদার দিকে বাড়িয়ে দিতে দাদা ব্যঙ্গ করে উঠল, তোর অত আনন্দ কিসের—অমন হবার আশা আছে?

কিন্তু বাবা দাদার মুখ দেখেই বোঝা গেছে, এমন হতে পারে

তা বলে এ-রকম বিয়ের প্রশ্রয় আমার কাছে নেই।

দীপুর মনে হয়েছিল, বাবার গলায় সেই রাশভারি মেজাজের ধারও আর নেই। আর মনে হল, সেই চটি জুতোর মারের যোগ্য জবাব তিন মাসের মধ্যে বাসুদা দিয়েছে।

দাদারও অত মাতব্বরি ভাব আর নেই। বলেছে, আই এ এস-এ থার্ড হয়েছে যখন ছেলে ভালো বলতেই হবে, যাক অনুটা অভাব অনটনের মধ্যে পড়বে না।

দীপুর বলতে ইচ্ছে করেছিল, পড়লেও তোমাদের কাছে হাত পাততে আসত আর কি ?

জামাই কি হল মায়ের বুঝতে একটু সময় লেগেছে। দাদাই চিবিয়ে চিবিয়ে বুঝিয়েছে মা-কে। বোঝার পর মা একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ল মনে হল দীপুর। বাবার আর বড় ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভেবে পেল না খুশির ভাব দেখাবে না গম্ভীর হয়েই থাকবে।

পরে ছোড়দির মুখে বউদির কথা শুনে দীপুর পিত্তি জ্বলে যাবার দাখিল। বউদি নাকি হেসে হেসে ছোড়দির সামনেই দাদাকে বলেছে, তোমাদের জামাইতো রত্ন বোঝাই যাচ্ছে—কিন্তু ওই রত্ন তোমার বোনেতে অমন মজল কি দেখে ?

অর্থাৎ দিদি যেন বউদির আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাবার মতো মেয়ে। এর এক ঘণ্টার মধ্যেই দিদির বাড়িতে ছুটেছে দীপু। বাসুদা আর দিদির মুখে খুশি ধরে না। দীপু বলল, সক্কলের মুখ এক্কেবারে ভোঁতা করে দিয়েছ বুঝলে বাসুদা—তোমার থেকেও বাবা মা দাদার মুখ দেখে আমার বেশি আনন্দ হচ্ছে।

দিদি স্নেহের ধমক লাগালো।—ছিঃ, ও-রকম বলে !

বাসুদা হেসেই জিজ্ঞেস করল, কেন ওঁদের মুখের আবার কি হল শালাবাবু ?

যা হল দীপু তার রসালো বর্ণনা দিল। তারপর এক পেট খেয়ে

ফিরল। বাড়ি ফিরে বাবা মা দাদা তিনজনকেই বসার ঘরে দেখল। ওর কেমন মনে হল বাসুদাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল। যে কৌতূহল একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশে আছে তাতেই সুড়সুড়ি পড়ল হঠাৎ। ···কি হবে, আবার না-হয় এক-প্রস্থ বকাবকি করবে ওকে। দেখাই যাক। চোখকান বুজে বলে ফেলল, বাসুদাকে কনগ্র্যাচুলেট করে এলাম—

শোনামাত্র তিনজনকেই একটু সচকিত মনে হল দীপুর। পরে কেবল দাদার ভ্রুতে একটু ভাঁজ। রাগ ছেড়ে বাবার গলায় আগ্রহের আভাস।—তুই এরই মধ্যে আবার ছুটে গেছলি সেখানে···তোর দিদিকে খুব খুশি দেখলি ?

—খুব। বাসুদা জিজ্ঞেস করল তোমরা খুশি হয়েছ কিনা···।

বাবা আর একটু সোজা হয়ে বসল।— খুশি হয়েছি বললি তো ?

—বাঃ! দীপুর বোকা মুখ।—তোমরা খুশি হয়েছ আমি জানব কি করে—তাই বললাম জানি না।

বাবা রীতিমতো বিরক্ত।—নিজে থেকে মাথা খাটানোর মতো এতটুকু বুদ্ধি যদি থাকতো তোর !

দাদা বিদ্রূপ করে উঠল, তাহলে আর জ্যাকি হবে কি করে— জ্যাকি অলওয়েজ জ্যাকি।

মা মিনমিন করে বলল, এবার গেলে দিদিকে বলিস, বাড়ির সকলে খুব খুশি হয়েছে।

তিনতলার শান্তির ঘরে এসে দীপু বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে হেসেছে। যত হেসেছে ততো তার ভক্তি শ্রদ্ধার পুঁজি ছোট হয়ে গেছে। আরো ছোট হয়েছে যখন ওই তিনজনের জটলার কথা ছোড়দি এসে জানিয়েছে। জটলার সার, লোককে গর্ব করে বলার মতো জামাই হয়েছে। মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করাই ভালো। বাবা মায়ের ইচ্ছে দাদাই আগে একবার যায়, তাই দাদা রীতিমত সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে।

ছোড়দিটা বোকার মতন দিদিকেও সব বলেছে। দিদি নিজে থেকে মিটমাটের রাস্তাটা খুলে দিল। ছোড়দিকে দিয়ে মায়ের কাছে আর্জি পাঠালো, মায়ের ঠাকুরের দয়াতেই এই ভাগ্যের মুখ দেখেছে। তাই ঠাকুরের কাছে পুজো দিতে চায়, বাবা মায়ের অনুমতি পেলে দিদি পুজো দিতে আসবে।

ব্যস, এরপর দাদার আর ছুটে যেতে বাধা থাকল না। ফিরে এসে হেসে হেসে বাবা মা-কে জানালো, সব ঠিক হয়ে গেছে, আর ভুল বোঝাবুঝি নেই। দাদা নাকি বাসুদাকে বুঝিয়েছে, আমাদের এতকালের রক্ষণশীল পরিবার, বোন বামুনের ঘরে যাচ্ছে···দিদির আর তাদের অকল্যাণের ভয়েই বাবা মা দিশেহারা হয়ে গেছল। এখন দেখছে ঠাকুর উল্টে আশীর্বাদ করলেন। আর বাবা মা-ও এতদিনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে···সংকোচে মুখ ফুটে আসতে বলতে পারছিল না। শুধু দিদি নয়, বাসুদাও আসবে কথা দিয়েছে। কবে আসবে কবে পুজো দেবে দাদা সেই দিন তারিখও ঠিক করে এসেছে। সামনের রবিবার অর্থাৎ মাঝের ছুটো দিন পরেই আসছে তারা।

মেয়েজামাই সম্বর্ধনার জন্য বাবা মা সকাল থেকেই ব্যস্ত। ব্যস্ত একটু দাদা বউদিও। তারা এলো। বিয়ে হয়ে যাবার তিন মাস বাদে বাড়িতে জামাই আসার শাঁখ বাজল, উলু-উলু শোনা গেল। দীপু তার তিনতলার ছাদের ঘরে বসে। থেকে থেকে ওর প্রিয় বই-গুলোর দিকে তাকাচ্ছে। প্রিয় প্রায় সব বই-ই, কেবল পড়ার বই ছাড়া। এগুলোর যে কোনো একটা নিয়ে বসলে মন কোথায় উধাও হয়ে যায়। ভিতরটা ভরে ওঠে। কিন্তু এ-সব বই সত্যি কিনা আজ ভাবছে। বাড়ির ভিতরেই যে চেহারা সব দেখছে সে-তো ভীষণ রকমের সত্যি—কিন্তু মানুষের এই চেহারার হদিস তো ওর এখানকার কোনো একটা বইয়েতেও নেই।

ছোড়দি ঘরে ঢুকল। ভারী ব্যস্ত মুখ। —কি রে, তুই এখানে শুয়ে, বাসুদা যে তোর খোঁজ করছে। তারপরেই গলা খাটো।—

বাবা-মা দাদা-বউদি বাসুদাকে কি খাতিরই করছে, দেখে আয় না হাঁদা কোথাকারের।

দৌড়ে চলে গেল। দীপু একটা বই টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আরো মিনিট পনের পরে দিদি এলো। —আমি কতক্ষণ হয়ে গেল এসেছি, আর তুই শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিস?

বই ফেলে দীপু সোজা উঠে বসল। —কেন এলে? এরা তোমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে কেন ভুলে গেলে?

রাগ দেখে দিদি থতমত খেল একটু। তারপর হেসে ফেলল।—এই রাগ তোর! কি বোকা রে তুই—তোর বাসুদা এত বড় হয়েছে বলেই তো আজ আমার এত গর্ব করে আসার দিন, এটুকু বুঝলি না?

—তুমি এলে এলে—বাসুদা কেন এলো?

—নাঃ, তুই দেখছি একেবারে বোকা, সে না এলে আমার মান থাকে না গর্ব থাকে? চল্ চল্, তোর খোঁজ করছে।

নেমে এসে দু চোখ ভরে দীপু এরপর বাবা-মা দাদা-বউদির জামাই আদর দেখেছে। দিদি ঠিকই বলেছে, বাসুদা না এলে এই দৃশ্য দেখা যেত না।

এরপর দিদির যাওয়া আসা সহজ হয়ে গেছে। বাসুদা অবশ্য কমই আসে। দীপুর একটাই লক্ষ্য এখন। এ-বাড়ি থেকে দিদি এক কাপড়ে বেরিয়েছিল। শাড়ি খাট বিছানা গয়না কিছুই পায়নি। বাবা এখন নিজে থেকে সে-সব দেয় কিনা সেটা দেখার প্রতীক্ষা। ভিতরে ভিতরে এ-নিয়ে একটু অস্বস্তি তাদেরও আছে বোঝা গেল। ছোড়দির খবর, এ নিয়ে বাবাতে মা-তে কথা হচ্ছে। দাদা নাকি এই আলোচনায় একেবারে নির্লিপ্ত।

এক সন্ধ্যায় বাবা দিদিকেই বলে ফেলল, —তোকে তো কিছুই দেওয়া হয়নি···তনুর বিয়ের চেষ্টা-চরিত্র করছি, পেলেই দিয়ে দেব··· যাক, তুই কি নিবি বল্—

এই নেওয়ার মধ্যে তনুর বিয়ের কথা তোলার অর্থ দিদি ঠিকই বুঝেছে। তাড়াতাড়ি বলেছে, তিন মাসের ওপরে হয়ে গেল এখন আবার নেওয়া দেওয়া কি! তোমরা আমাদের জন্য কিছু ভেবো না, কেবল আশীর্বাদ রেখো—তনুর বিয়ে খুব ভালো করে দাও।

বাবা বলল, তা কি করে হয়, এখন যখন কোনো দিকেই আর কোনো ক্ষোভ নেই—জামাইয়ের কাছে আমাদের একটা মান-মর্যাদা আছে তো!

দিদি জোর দিয়ে বলল, এখন ও-সব করতে গেলেই বরং হাসির ব্যাপার হবে বাবা —আর তোমাদের জামাইও খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়বে—যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, তুমি এ নিয়ে কিচ্ছু ভেব না— আমি থাকতে জামাইয়ের কাছে তোমাদের কোনরকম অমর্যাদা হবে না জেনে রেখো।

এরপর বাবার নিশ্চিন্ত মুখ। দিদিটাকেই ধরে দুটো ঝাঁকানি দিতে ইচ্ছে করেছিল দীপুর। শেষ পর্যন্ত দিদির জন্য দু গাছা বালা আর একটা বেনারসী তারা কিনেছে। আর বাসুদার জন্য একটা ঘড়ি আর এক সেট সোনার বোতাম! এ-ও দিদি খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়েছে দীপু আঁচ করতে পেরেছে।...বাবার রোজগার আগের মতো হয়তো নেই, কিন্তু এর বেশি করার মতো নেই এ দীপু বিশ্বাসই করে না।

নিচেরতলায় বড়দার খাতিরে ভাড়াটে অনেক দিনই এসেছে। কারা এলো না এলো দীপু ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি। রতনদের ওভাবে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে যারা এসেছে তাদের প্রতি খুশিও নয়। তবে কে এলো জানে। কোন বড় ফার্মের চারটারড অ্যাকাউনটেন্ট নাকি। বাইরের কাজও করে ভদ্রলোক পরে তাও বোঝা গেছে।...ছ মাসের মধ্যে অনেক সন্ধ্যায় খাতাপত্র নিয়ে বাবাকে

আর দাদাকে একতলায় চলে যেতে দেখেছে। তারপর আস্তে আস্তে মদের বোতল আর মিষ্টির বাক্সর ভেটও যেতে দেখা গেছে। গুণতির বয়েস ষোল হলেও দীপুর ভিতরের বয়েস এর মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। একতলায় ভদ্রলোক বাড়তি লাভের রাস্তা বা বাড়তি ফাঁকির রাস্তা বাতলে না দিলে এ-রকম ভেট পাঠানোর কোনো কারণ থাকতে পারে না। অবাক হয়ে দীপু এখনো মাঝে মাঝে ভাবে, তার শান্তির ঘরের বইয়ের তাকে যে-সব মানুষগুলো বসে আছে তারা কি রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল না? রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ গান্ধী সুভাষ বোস যীশু ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল আব্রাহাম লিঙ্কন—এরা সব কি তাহলে শুধু মন ভোলানো আদর্শের দৃষ্টান্ত!

দীপুর আরো যন্ত্রণা, ইদানীং ওর ভিতরের প্রতিক্রিয়া মাস্টার-মশাইকেও খোলাখুলি বলতে পারে না। বলা মানেই তো বাড়ীর নিন্দে। মাস্টারমশাই বলতেন, কারো প্রশংসা করার কিছু পেলে করবি, নিন্দের কথা নিজের মন থেকে মুছে ফেলবি। কিন্তু দীপু আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও বাড়ির কারো মধ্যে প্রশংসার কিছু খুঁজে পায় না।

পরের ছ মাসের মধ্যে দীপুর সব মনোযোগ আবার আর একদিকে ঘুরে গেল। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো ষোল বছর বয়েস হয়ে গেল এখনো ড্রাইভিং শেখাটা হল না। দাদা শুনেছে পনের বছর বয়সে বাবার গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসা শুরু করেছিল। দীপু চোদ্দ বছর বয়সেই একবার ঝোলাঝুলি করে দেখেছিল। বাবা বা দাদার কারো পারমিশন মেলেনি। বাবা তখন বলেছিল ষোল বছরের আগে নয়। আর দাদার মুখ দেখে মনে হয়েছিল কোনদিনই সে এটা বরদাস্ত করবে না।

বাবা রাজি হলে দীপু দাদার বলার ধার ধারে না। মায়ের মারফৎ বাবার কাছে আরজি পেশ করল। তার কারণ, এই বাড়ির গাড়ি নিয়ে মায়ের কিছু ক্ষোভ আছে। বড় চাকুরে বড় ছেলেকে

আফসের গাড়ি এসে দিয়ে যায় নিয়ে যায়। আর বাবার গাড়ির পুরনো বুড়ো ড্রাইভার বাবার দরকার মতো ঘড়ি ধরে আসে ঘড়ি ধরে চলে যায়। এমনিতেই তার ক্ষোভ, দিন-কাল অনুযায়ী সাহেব তাকে ভালো মাইনে দেয় না। তাই বাবার কাজের আগে এসে বা পরে থেকে সে বাড়ির দরকারে লাগার পাত্র নয়। অথচ বাড়িতে একটা গাড়ি থাকতেও মা একটু কালীঘাটে যেতে পারে না, দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারে না—নিজের বোনের বাড়িতেও যেতে পারে না। আর মেয়ে দুটোও বাড়িতে গাড়ি থাকার সুখ সুবিধে থেকে একেবারে বঞ্চিত। মায়ের অনেক দিনের ইচ্ছে, পুরনো বুড়ো ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দিয়ে বাড়িতে থাকা-খাওয়া আর কিছু মাইনে দিয়ে নতুন ড্রাইভার রাখা হোক। কিন্তু বাবা সে কথা কানেই তোলে না।

অতএব দীপুর আর্জি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সেটা পছন্দ হল। কিন্তু মুখে বলল, যে-ছেলে তুই, তোর হাতে গাড়ি দিই আর দিন-রাত তুই ওই গাড়ি নিয়েই পড়ে থাক্—

দীপু তক্ষুনি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করল, পড়াশুনার এতটুকু ক্ষতি না করেই ও গাড়ি চালানো শিখবে। তারপর মায়ের মারফৎ ছোট ছেলের আর্জি শুনে বাবা হাঁ-না কিছু করার আগেই দাদার সাফ, না। বলল, আঠারো বছরের আগে লাইসেন্স পাবে না—হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করুক তারপর দেখা যাবে। এমনিতেই তো জ্যাকি হয়ে বসে আছে—পড়াশুনার সর্বনাশ হতে আর বাকি থাকবে না তাহলে।

দীপু গোঁ গোঁ করে বলল, বাবা কথা দিয়েছিল ষোলো বছরে শিখতে দেবে। আর আমি মাকে বলেছি পড়াশুনার ক্ষতি না করে শিখব। তুমি তো ষোলকে আঠারো করে নিয়ে লাইসেন্স পেয়েছিলে, আমার পেতে পেতে এমনিতেই সতের গড়াবে।

বাবা প্রথমে ওকেই ধমকে উঠল, এত বড় দাদার মুখের ওপর কথা বলিস এই শিক্ষা হচ্ছে!…ষোলো বছর বয়েস পর্যন্ত তোর

মতিগতি বোঝার জন্যেই আমি কথা দিয়েছিলাম—দাদা ঠিকই বলেছে, গাড়িতে হাত দিলে তোর পড়াশুনা শিকেয় উঠবে।

কিন্তু বাবা এ-দিকে মায়ের মন বা ইচ্ছেও খুব ভালো করেই জানে। তাই দাদাকে ও-ভাবে তোয়াজ করার পর একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, তবে যদি কথা দিস দিনে এক ঘণ্টার বেশি গাড়ি ছুঁবি না, তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে।

দীপু ঘাড় কাঁধে ঠেকিয়ে বলল, তাই হবে।

গম্ভীর মুখে বাবার উদ্দেশে দাদা মন্তব্য করে গেল, ভালো করলে না।

দীপু হাতে চাঁদ পেল। দাদা খেয়েদেয়ে সকাল নটায় অফিস চলে যায়। ফেরে সন্ধ্যায়। তার মধ্যে হাতের নাগালে গাড়ি পেলে ও কত দফায় ক ঘণ্টা গাড়ি নিয়ে পড়ে আছে জানছে কি করে। বাবা বেশিরভাগ দিন আজকাল খেয়েদেয়ে ছোট একটা ঘুম দিয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরোয়। আবার অনেক দিনই চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরে আসে। ওর সুবিধের জন্যেই যেন বাবার কাজে-কর্মে আরো বেশি মন্দা এসেছে।

দীপু যে কৌতূহল নিয়ে পিঁপড়ে আর আরশোলা অপারেশন করত, যে কৌতূহল নিয়ে মায়ের সেলাইয়ের মেশিন আর বাবার ঘড়ির ডালা খুলেছে—গাড়ি হাতে পাবার পর তার সে-কৌতূহল আর উৎসাহ চারগুণ বেশি। এ-ও যেন ছোটখাটো এক কল কব্জার রাজ্য। একটা গাড়ির ভিতরে এত রকমের যন্ত্রপাতি থাকতে পারে খুব একটা ধারণা ছিল না। অবশ্য একেবারে ছিল না এমন নয়, বাড়ির একশ গজের মধ্যে যে গ্যারাজে ওদেরও গাড়ির কাজ হয়, তখন অনেক সময় দীপু গিয়ে গিয়ে ওদের গাড়ির কাজ দেখত। কিন্তু এমন একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু দেখা হয়ে ওঠেনি।

…গাড়ি চালানো শেখার ব্যাপারে দীপু দস্তুরমতো তার মগজ খাটিয়েছে। বাড়তি টাকা কবুল করে মা বিকেলে এক ঘণ্টার জন্য

পুরনো বুড়ো ড্রাইভারের কাছে ওর গাড়ি চালানো শেখার ব্যবস্থা করেছে। পুরনো ড্রাইভার রামসিং-এর কাছে বাড়তি টাকার কদর খুব। এদিকে সামনের গ্যারাজে দু দুটো মিস্ত্রি আছে যারা গাড়ি চালানোতেও এক্সপার্ট। হরদম কারো না কারো গাড়ি ঠিক করে ট্রায়েল দিতে বেরোয়। দীপুর তাদের সঙ্গে আগেই ভাব ছিল, এখন ওদের দুজনকে চা-টা খাইয়ে ভাল ভাব করে নিল। গত জন্মদিনে দিদি ওকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যা-খুশি কিনে নিতে বলেছিল। সেটা গাড়ি চালানো শুরু হবার পরে। এই জন্মদিনে দীপু মায়ের কাছ থেকেও পঞ্চাশটা টাকাই চেয়ে নিয়েছে। ওই টাকা থেকে কুড়িটা টাকা আলাদা করে রাম সিংকে দিয়েছে—ফাঁক মতো ওর আরো বেশি সময় গাড়ি চালানোর ব্যাপারে আপত্তি করবে না, এই শর্ত। বাকি তিরিশ টাকা গ্যারেজের ওই মিস্ত্রিড্রাইভার দুজনকে দিয়েছে। ওরা ছোটখাট মেকানিজম শেখাবে ওকে, হাত আর একটু পাকা হলে ট্রায়েলের গাড়িও ওকে চালাতে দেবে। মিস্ত্রি দুটো হাতে কাঁচা টাকা পেয়ে তো বটেই, ওর আগ্রহ দেখে আরো খুশি হয়েছে। এই শেষের ব্যাপারটা বাড়িতে একেবারে গোপন।

এরপর মনপ্রাণ দিয়ে দীপু মোটর গাড়ির রাজ্যে ঢুকে গেছে। সকালে স্কুলে যাবার সময় আধঘণ্টা তিন কোয়ারটার আগে গিয়ে মোটর গ্যারাজে ঢুঁ দেয়। স্কুলের পর জলটল খেয়েই আবার ছোটে - রাম সিং এসে ওকে ওখান থেকেই তুলে নিয়ে যায়। আর স্কুল ছুটির দিনে দুপুরে ছাদের স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বিকেল পর্যন্ত ওই গ্যারাজে। হাত এক মাসের মধ্যেই দিব্বি পেকেছে বুঝেই মিস্ত্রিরা পাশে বসে ওকে ট্রায়েলের গাড়ি চালাতে দেয়। স্কুলে ছুটির দিন তো আর কম নয়। শুধু ট্রায়েলের গাড়ি কেন, এটা ওটা সারানোর নাম করে বাবার গাড়িটাও গ্যারাজে এনে ফেলে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে আর ধরছে কে। ভাবনা তেল খরচের। কিন্তু বাবার তখন তা বলে ঠিক-ঠিক তেলের হিসেব রাখার মতো অবস্থা

নয়। তাছাড়া, পুরনো গাড়ির ছোট-খাটো মেরামাত তো লেগেই আছে, আর তারপর ট্রায়েল দেওয়া আছে। এ-ব্যাপারে বুড়ো রামসিং আর ওই দুই মিস্ত্রি সহায় হলে তেলের জন্য ওকে ধরছে কে?

এমনই নেশা ধরে গেছে দীপুর যে এ-সব সত্ত্বেও তেলে টান পড়লে এক-এক সময় ভাবে বই কেনার নাম করে মায়ের কাছ থেকে তেলের টাকা যোগাড় করবে। কিন্তু লোভ সত্ত্বেও সেটা পেরে ওঠেনি। মনে হয়, শান্তির ঘরের বইগুলো সব ওর দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে। অনেক সময় সরাসরি মায়ের কাছে টাকা চেয়ে পেয়ে গেছে। গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেছে শুনে বাবাকে বিরক্ত না করে মা টাকা বার করে দিয়েছে।

গাড়ির বিদ্যেটা দীপু এত নিশ্চুপে রপ্ত করেছে যে দাদা কিছুমাত্র টেরও পেল না, ভাই এমন গাড়ি বিশারদ হয়ে গেল কি করে। দু মাসের মধ্যে দীপুর হাত দস্তুরমতো পাকা। শুধু তাই নয়, গাড়ির চাকা লাগানো, চাকা খোলা, গীয়ার লিভারের হ্যাণ্ডেল ভাঙলে সেটা খুলে নতুন লাগানো, ফ্যান বেল্ট বা অ্যাকসেলেটারের তার ছিঁড়লে খোলা বা লাগানো, ইলেকট্রিকের ছোট-খাটো মেরামতির কাজ, ব্রেক-এর অবস্থা বুঝে ব্রেক অয়েল দেওয়া—এমন কি গাড়ি টিউনিং-এর কাজ পর্যন্ত মোটামুটি রপ্ত।

কিন্তু লাইসেন্স নেওয়ার ব্যাপারে দাদার কথা শুনে বাবা আর কান পাতে না। লারনারস লাইসেন্সই চলছে। রামসিং ভরসা দিয়েছে, ছোট দাদার হাত খুব পাকা হয়ে গেছে—তবু না। অনেক বায়নার পরে দাদার কাছেই প্রথম পরীক্ষা দিতে হল। এক ছুটির দিনে ওর পাশে বসে দাদা বলল, খুব সাবধানে চালাবি, তোর কেরামতি দেখি।

পনের মিনিট ধরে ভিড়ের মধ্যেও পরিষ্কার চালালো, তবু দাদা আড়ষ্ট—ঘন ঘন উপদেশ, এই কর ওই কর—সাবধান, আস্তে। দীপু তখন হেসেই বলেছে, দাদা তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এই গাড়ি নিয়ে আমি অনেকবার শ্যামবাজার বাগবাজার বড়বাজার করেছি। বরাত সেদিন

আরো একটু প্রসন্ন দীপুর। শব্দ করে পুরনো গাড়ির একটা চাকা ফেঁসে গেল। মাঝ রাস্তায় গাড়ি অচল। দাদার মুখ শুকনো—পিছনের ক্যারিয়ারে স্টেপনি আছে, কিন্তু লাগায় কে। দাদা লাগাতে জানে না।

দীপু নামল। দাদার সাহায্যে গাড়ি একটু ঠেলে ফুটপাথের ধারে নিয়ে এলো। তারপর যন্ত্রপাতি বার করে দশ মিনিটের মধ্যে চাকা বদলে আবার গাড়ি রেডি।

বাড়ি ফিরে দাদা মন্তব্য করল, লাইসেন্স পাওয়ার পরীক্ষা দিতে পারে, মোটামুটি হয়েছে।

দীপু এক চান্সেই লাইসেন্স পাবে জানত। পেল। তারপর মায়ের অনেক দিনের খেদ মিটল। ছেলের লাইসেন্স পাওয়ার কল্যাণে প্রথমে কালীঘাটে পুজো চড়াতে গেল—বলা বাহুল্য ড্রাইভার দীপু। এরপর ও-ই তাগিদ দিয়ে মাকে দক্ষিণেশ্বরে বেলুড়ে নিয়ে গেছে। মাসির বাড়ি নিয়ে গেছে। মা বৌদি আর তার বাচ্চাকে গঙ্গার ঘাটে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এসেছে। শেষে একদিন ওই মোটরগাড়ির জগৎটাও তার কাছে পুরনো হয়ে এসেছে। এরপর অর্থাৎ আরো একটা বছর না যেতে মাকে এসে তাগিদ দিতে হয় এখানে ওখানে নিয়ে যাবার জন্য। বাড়িতে গাড়ি থাকলে বউদির যখন তখন বাপের বাড়ি যাবার চলনদারও দীপু—গাড়ি ওকেই ড্রাইভ করতে হয়, কিন্তু ভালো লাগে না। আরো ভালো লাগে না কারণ বউদি তার ছেলে নিয়ে পিছনের সীটে বসে, আর দীপু ড্রাইভারের মতো সামনে বসে গাড়ি চালায়। দীপুর প্রায়ই এরপর মনে হত, মোটর ড্রাইভিং কিছু নয়, এরোপ্লেন চালানোটা শিখতে পারলে এর থেকে ঢের বেশি রোমাঞ্চকর ব্যাপার হত।

দীপুর কাছে পুরনো হয়নি কেবল তার তিনতলার ছাদের ঘরের জগৎ—তার শান্তির ঘর। কিছুদিনের ছেদ পড়েছিল, আবার সে-ঘরে নতুন নতুন মুখের আমদানি হচ্ছে।

॥ চার ॥

আর মাস চারেক গেলে সতেরো পেরিয়ে আঠেরোয় পড়বে দীপু। এমনিতে লম্বা গড়ন, এর মধ্যে মাথায় আরো খানিকটা ঢ্যাঙা হয়েছে। নাকের নিচের পাতলা গোঁফ আরো একটু ঘন হয়েছে। এখন পর্যন্ত ওতে কাঁচি বা ক্ষুর পড়ে নি। স্কুলে-পড়া ছেলেদের তখনো হ্যাফপ্যাণ্ট পরার যুগ। দীপুরও তখন পর্যন্ত হাফপ্যাণ্ট আর সার্ট চলছে। আর তাতে যে ওকে বেশ স্মার্ট দেখায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই সে সেটা অনুভব করতে পারে। দীপুর গায়ের রং দাদার থেকে কিছু কালোই। কিন্তু বড় চাকুরে দাদাকে ওর পাশে এখন বরং আনস্মার্ট লাগে। লাল জলের কল্যাণে দাদার বেশ একটু ভুঁড়ি হয়েছে। বউদির মেজাজ ভালো থাকলে ঘুরিয়ে দীপুর প্রশংসা করে।—একটু কেষ্ট ঠাকুর কেষ্ট ঠাকুর ভাব এসেছে তোর মুখে, খবরদার কোনো মেয়েটেয়ের সঙ্গে মিশবি না। চেহারার এই শ্রীর পিছনে আসলে যোগব্যায়াম। এতে একদিনের জন্যও ছেদ পড়ে না।

এবারে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেবে। এবারে বলতে এখনো মাস সাতেক দেরি। তখনো ওর বয়স আঠেরো চলবে। এই নিয়েও দাদার টিপ্পনী। সে নাকি সতেরোয় হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়েছিল। সামনে পড়লেই পড়াশুনার ব্যাপারে সমঝে দেয়। বলে—এখন আর অন্য কোন রাজ্যে মন না দিয়ে পড়ার বইয়ের দিকেই নজর দে। হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট ভালো না হলে ডাক্তারি এনজিনিয়ারিং দু রাস্তাই বন্ধ, চিরজীবন তখন জ্যাকি হয়েই থাকতে হবে। বলে বটে, কিন্তু ওর ভবিষ্যত নিয়ে দাদার ভাবনা কত তা ও বিলক্ষণ

জানে। কখনো হয়তো [illegible]
তোর বউদিকে একটু ওমুক দোকানে বা ওমুক জায়গায় নিয়ে যা। অথবা, ছেলেটাকে চাইল্ড স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাবে তোর বউদি—গাড়িটা বার কর। একবারও আগে জিগ্যেস করে না, দরকারি পড়া কিছু করছিল কিনা।

যাক, দীপুর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার আগেই বাড়িতে দু দুটো ঘটনা। না, ঘটনা একটাই—ছোড়দির বিয়ে। দ্বিতীয়টা জ্যাকির জগতে একটা নতুন কৌতূহলের সূচনা—একতলার ফ্ল্যাটে আবার এক নতুন ভাড়াটের পদার্পণ। এই নতুন ভাড়াটেরা এসেছে ছোড়দির বিয়ের দিনকুড়ি বাইশ আগে।

···কারণ ভিন্ন হলেও দিদির মতো ছোড়দির বিয়ের আগেও দীপুর জগৎটা বেশ নাড়াচাড়া খেয়েছে। বাড়ির মানুষদের এই আচরণেও মানুষের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা কমেছে। রাগে গুমরে উঠেছে। এ-ও মাস্টারমশাইকে বলা যায় না। মাস্টারমশাই নিন্দের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে বলেন। কিন্তু ভিতরে এ-ধরনের আঁচড় পড়লে কি করবে তার হদিস বোধহয় জানেন না। দীপু খোলাখুলি সব বলে নিজেকে একটু হালকা করতে পারত, দিদি এখানে থাকলে। বাসুদা কলকাতার বাইরে পোস্টেড এখন। দিদিও সেখানে। তারা বড় জোর বিয়ের দুই একদিন আগে পৌঁছুবে।

ছোড়দির বয়েস একুশের মাঝামাঝি হতে বাবা মা তার বিয়ের জন্য সত্যি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দীপু সেটা অস্বাভাবিক কিছু ভাবেনি। একে তো ছোড়দির গায়ের রং দীপুর থেকে পরিষ্কার নয়, তার ওপর নিজের দোষেই একটু মুটিয়ে যাচ্ছিল। অন্য দিকে দাদার চাকরির যেমন উন্নতি হচ্ছে, বাবার সেই রকমই কমছে। দীপু লক্ষ্য করেছে বাবার কাজের উৎসাহতেও ভাটা পড়েছে। এক-একদিন মেজাজ দারুণ খারাপ থাকে।

ছোড়দির বিয়ের জন্য ঘটক লাগানো হয়েছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আবার ক্রমাগত পাত্রের বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েও কিছুই আর এগোচ্ছিল না। অনেক জায়গায় মেয়ে পছন্দ হয় না, অনেক জায়গায় ঠিকুজি মেলে না বলে এগনোই হয় না। দিদির বিয়ে অমন হওয়াতে মায়ের দিক থেকে ঠিকুজি মেলানোর বাই কমেছে—আর ছোড়দির ঠিকুজি এমনি যে মা ছেলের ঠিকুজি নিয়ে টানা হেঁচড়া আর করতেই চায় না। ছোড়দির ঠিকুজিতে এক-গাদা কি কি সব দোষ আছে নাকি। কিন্তু পাত্রপক্ষ যারা ঠিকুজি মিলিয়ে এগোতে চায় তাদের ঠেকানো যাবে কি করে? এই ঠিকুজি মেলাতে গিয়ে একে একে কয়েকটা ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেল।

শেষে ঘটকই একটা সম্বন্ধ নিয়ে এলো। বনেদি ঘর। কলকাতায় নিজেদের বাড়ি। ছেলে এম-এ পাশ। সে-রকম উঁচু দরের না হলেও মোটামুটি ভালো চাকরি করে। মেয়ে নেই, তিনটে ছেলে। আপাতত একসঙ্গে থাকলেও ছেলের বাপ তিন ছেলের নামে তিন পোরশান লেখা-পড়া করে দিয়েছে। তারা চোখ বুজলে ছেলেরা যে যার আলাদা থাকবে। বাবা খোঁজ নিয়ে জেনেছে ছেলেটা সত্যি ভালো।

ঘটকের সঙ্গে বাবা আর দাদা গেছল ছেলের বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ি ঘর দেখে বাবার খুব পছন্দ হয়েছে। আর তাদের নাকি ছোড়দির ফোটো দেখে মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। অতএব গোড়ার কথা-বার্তা চালাতে অসুবিধে হয়নি। সেই কথা থেকে বাবা যা বুঝে এসেছে ছোড়দির বিয়ের জন্য যে-টাকা ব্যাঙ্কে তোলা আছে তার থেকে আরো হাজার পাঁচ-ছয় বেশি খরচ হবে। কিন্তু ছোড়দির বিয়ে নিয়ে বাবার এখন এত ভাবনা যে একটুও দ্বিধা করেনি, বেশি লাগলে লাগবে।

তারপর এখানেও সেই ঠিকুজি মেলানোর প্রশ্ন। দাদা নাকি বলেছিল, আজকের দিনে এ-সবে কেউ আর তেমন বিশ্বাস-টিশ্বাস

করে না। কিন্তু ভদ্রলোকের জবাব, ঠিকুজি মিলিয়েই তারা কাজ করে থাকে। মেয়ের ঠিকুজিটা যাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, মিললে মেয়ে দেখার প্রশ্ন।

গাড়িতে বাবা বিমর্ষ, কারণ ধরেই নিয়েছে ঠিকুজি মিলবে না। কিন্তু এই বারে দাদা বুদ্ধির চমক দেখিয়েছে। ফেরার পথে ঘটককে জিগ্যেস করেছে, ওই ছেলের ঠিকুজি তার কাছে আছে কিনা। ছোটাছুটির আগে নিজেরাই একবার দেখে নিতে পারলে ভালো হত। ঘটক জানিয়েছে, তার কাছে ছিল, খুঁজে দেখতে হবে। দাদা তক্ষুনি তার হাতে পরদিন যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া গুণে দিয়েছে।

ছেলের ঠিকুজি আগে হাতে এসেছে। বিচারে দেখা গেছে মিলের ধারে কাছেও নেই। কিন্তু মিলবে না বলে আগের ভাগে ছেলের ঠিকুজি আনা হয়নি, মেলানোর জন্যেই আনা হয়েছে। তাতে পঁচিশটি মাত্র টাকা দাদার পকেট থেকে খরচ হয়েছে। এরপর ছোড়দির যে ঠিকুজি ছেলের বাড়ি পাঠানো হয়েছে তা মেলানোর পর পাত্রের বাপ সাগ্রহে ফোনে উত্তমশ্রেণীর রাজযোগ হয়েছে জানিয়ে তারা মেয়ে দেখার দিন ঠিক করেছে।

···যে-কারণেই হোক ছোড়দির ঠিকুজির নাম শুনলে রাগ। বড়দি সেটা জানে বলেই দাদার কেরামতির বিস্তারিত ছোড়দিকে বলেছে। আর ছোড়দিও তেমনি হেসে হেসে দীপুকে সব বলে ওর জগৎটাকে বিলক্ষণ নাড়া দিয়ে গেছে। দীপু জিজ্ঞেস করেছে, তোর রাগ হচ্ছে না ?

—রাগ হবার কি আছে, ও-সব কুষ্টিফুষ্টি মেলানোর কোনো মানে আছে—পৃথিবীর কোনো কায়েতের মেয়ের ঠিকুজি বামুনের ছেলের ঠিকুজির সঙ্গে মেলে ? অথচ দিদি আর বাসুদার মিলখানা কোনো মিলের থেকে কম ! তোকে বলেই দেখছি ভুল করলাম—খবরদার এনিয়ে কারো কাছে মুখ খুলবি না।

···দাদা এ-রকম একটা কাজ করল বাবা জানে মা জা

ছোড়দিও জানে। হতে পারে দিদি এদের সংস্কার ভেঙে দিয়েছে। দীপু তো ও-সব নিয়ে মাথাই ঘামায় না।···কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় মিথ্যাচারকে আঁকড়ে ধরতে কারো বিবেকে বাধল না? দীপু সারি সারি বইগুলোর দিকে তাকালো।···ও কি এবার এই জগৎটাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে?

যথাসময়ে ছেলের পক্ষ ছোড়দিকে দেখে গেল। বি-এ পাশ ছোড়দি দিদির থেকেও এমনিতে চটপটে বেশি। ছেলের বাবা মায়ের পছন্দ হয়েছে বলেই গেল। ঠিকুজির মিলের জোরে ছেলের বাবা ছোড়দিকে সুলক্ষণা দেখেছে, যাবার আগে সে-কথা বাবাকেই বলেছে। জানিয়েছে, তাদের দেখাটাই ফাইন্যাল, তবু দুই একজন বন্ধুকে নিয়ে ছেলে একবার দেখবে।

দেখেছে। এবারে ছোড়দি আরো সপ্রতিভ, স্বল্পভাষিণী কিন্তু আরো স্মার্ট। ঘায়েল করতে পারবে এই বিশ্বাস নিয়েই আসরে এসে বসেছিল।

তারপর বিয়ের দিন তারিখ পাকা। বাড়িতে বিয়ের বাতাস। দিন এগিয়ে আসছে। সোনা গয়নার অর্ডার চলে গেছে। শাড়ি-টাড়িও কেনা শুরু হয়েছে। কখনো ছোড়দি আর বউদিকে নিয়ে দীপু সকাল বিকেল দুবেলাই গাড়ি হাঁকিয়ে দোকানে যাচ্ছে, আসছে। এখন আর কেউ দীপুর পড়ার খোঁজ নেয় না। কেবল মাস্টারমশাই ছাড়া।

ছোড়দির বিয়ের কুড়ি বাইশ দিন আগে নিচেরতলায় ওই নতুন ভাড়াটে এসেছে। আগের চারটারড অ্যাকাউনটেন্ট আরো বড় ফার্মে কাজ পেয়ে বম্বে না কোথায় চলে গেছে। সেই ভদ্রলোকই বাবাকে এই ভাড়াটে দিয়ে গেছে। বাবার তাতে লাভ বই লোকসান হয়নি। ভাড়া এখন পাঁচশর জায়গায় আট শ'—আর বাড়ি সারাই

সংস্কার ইত্যাদির নামে সাত হাজার টাকা সেলামী। যে এলো সেই ভদ্রলোক জাহাজের বড় চাকুরে ছিল। জাহাজে জাহাজে পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরেছে নাকি। সত্ত সত্ত রিটায়ার করে এখন পাকাপোক্ত-ভাবে ডাঙায় বাস। চারটারড অ্যাকাউনটেন্ট সাহেব দাদাকে বলে গেছে, নতুন ভাড়াটের টাকার জোর আছে। সেই কারণে আর, সমস্ত জীবন ওই গোছের চাকরির কারণে মেজাজ একটু চড়া—কিন্তু দিলের মানুষ, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাড়া দিন। চারটারড অ্যাকাউনটেন্ট সাহেবের দূর সম্পর্কের আত্মীয় নাকি।

বাবার বা দাদার আপত্তির কোনই কারণ নেই।

নতুন ভাড়াটের দল আসতে দাপু প্রথমে অবাকই একটু। একতলায় রূপসী প্রমীলার হাট বসে গেছে যেন। ভদ্রমহিলা অর্থাৎ বাড়ির কর্ত্রী যেমন রোগা তেমনি উৎকট রকমের ফর্সা। কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ না থাকলে শাড়িপরা মেমসাহেব মনে হত। এ-দেশের লোককে বিয়ে করে বিলিতি মেমসাহেবও নাকি শাড়ি সিঁদুর-টিঁদুর পরে। কিন্তু পরে মহিলার মুখে স্পষ্ট বাংলা কথা শুনে দীপুর সংশয় গেছে।

তার পাঁচ পাঁচটা মেয়ে। ছেলে একটাও দেখল না! সকলের বড়র বয়েস তিরিশ হবে, সকলের ছোটর চৌদ্দ-চৌদ্দ। কার বিয়ে হয়েছে কার হয়নি বোঝা ভার। কপালে সিঁথিতে কারো সিঁদুর নেই। মেয়েগুলোর কেউ মোটার দিক ঘেঁষেছে, কেউ মায়ের মতো রোগার দিকে। কিন্তু সকলেই দারুণ ফর্সা। কেবল ছোট দুটো মেয়ের নিটোল স্বাস্থ্য। ফলে তারা দস্তুরমতো রূপসী। চৌদ্দর ওপরেরটি বড় জোর উনিশ হবে। ছোট মেয়ে বাদে বাকি মেয়েগুলো প্রথম ক'দিন কেবল আসছে যাচ্ছে, যাচ্ছে আর আসছে। মাঝে মাঝে একটা গাড়ি থেকেও নামতে দেখছে তাদের। আবার তারপর একজন দুজন করে পুরুষেরও আনাগোনা দেখছে। ব্যাপারখানা কি জানতে বুঝতে দীপুর কম করে সাত দিন সময় লেগে গেল।

এ-রকম একটা পার্টি দেখে বউদিই আগে গিয়ে আলাপ করেছে। পাঁচ মেয়ের মধ্যে বড় চারটিরই বিয়ে হয়ে গেছে। চতুর্থ মেয়ের বিয়ে হয়েছে মাত্র চার মাস আগে। সে নাকি এক ইউ পি-র ছেলেকে বিয়ে করেছে। বড় তিন মেয়েও তিন রকমের বিয়ে করেছে। একজনের বর কমিউনিস্ট, একজনের বর মাড়োয়ারি ব্যবসাদার, আর একজনের এক্স-ক্রিকেট স্টার—খেলার দৌলতে এখন কোন্ ব্যাঙ্কের অফিসার। চার মেয়েই স্বয়ংবৃতা অর্থাৎ যে-যার পছন্দমতো বর বেছে নিয়েছে—তাতে বাপ-মায়ের আপত্তির বা মতামতের প্রশ্নই নেই। যে গাড়িটা মাঝে মাঝে যায় আসে সেটা ওদের মাড়োয়ারি ব্যবসাদার জামাইয়ের। গাড়ি আর কোনো জামাইয়ের থাকলে চোখে পড়ত। প্রথম সাত দিন ভদ্রলোকের সব মেয়েরাই এখানে ছিল বলে দীপুর জানতে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। এখনো মেয়েরা হামেশাই যায় আসে, কিন্তু মেয়ে বলতে নিচের ফ্ল্যাটের স্থায়ী বাসিন্দা কেবল ছোটটি সেটা বোঝা গেছে।

বড় বউদির আরো খবর, স্বামীর জাহাজের চাকরি জীবনে ভদ্রমহিলা মেয়েদের নিয়ে তিন-তিন বার জাহাজে পৃথিবী পাড়ি দিয়েছে। জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে স্বামীর যে-চুক্তি ছিল, তাতে আরো অনেকবার ঘোরাঘুরি করা যেত, কিন্তু মাসের পর মাস শেষে ও-ভাবে জলে ভাসতে বিরক্তি ধরে যেত। তাছাড়া মেয়েদের পড়াশুনারও ক্ষতি হত।

এই মেয়েরা জাহাজে চেপে তিন-তিনবার সমস্ত পৃথিবী দেখেছে দীপুর কাছে এটা খবরের মতো খবর বটে! ওই ছোট মেয়েটা পর্যন্ত পৃথিবীর এত জেনেছে দেখেছে এ কি ভাবা যায়! দীপু কিনা সেই ছেলেবেলায় একবার বাবা-মা দাদা-দিদিদের সঙ্গে রাঁচি বেড়াতে গেছল—সে-ও এখন আর কিছু মনেই নেই—তাছাড়া বছরের পর বছর তো শুধু কলকাতার মধ্যেই আটকে আছে। শুনেই দীপুর মন দূরের সমুদ্রে পাহাড়ে জঙ্গলে উধাও হতে লাগল।

... নাম কি এখনো জানে না, কিন্তু ওই মেয়েটাকে সবার আগে

লক্ষ্য করেছে বই কি। করেছে, কারণ না করে পারেনি। বয়সের তুলনায় একটু বাড়ন্ত গড়ন। আর কি ফর্সা, যেন মোমের তৈরি শরীর। চুলের সামনের দিকটা সামান্য কোঁকড়া। লালচে ঠোঁট। ভালো করে দেখার সুযোগ না হলেও মনে হয়েছে চোখ দুটো যেন ভারি সজাগ আর সপ্রতিভ আর দুষ্টুমিতে ভরা। যখন যে রঙের ফ্রক পরে তাতেই অদ্ভুত মানায়।

এদিকে দীপুকেও যারা বোকা বলে বোকা তারাই। সে-ও যে ওই মেয়েটার কিছু বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পেরেছে তা-ও অনুভব করতে পারে। এই বয়সের একটা ছেলে সকালে বিকেলে মা-কে ছোড়দিকে বউদিকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, আবার সদাইপত্র সেরে তাদের নিয়ে ফিরছে—এটুকুই মেয়েটার বিস্ময় আর মনোযোগের কারণ। দীপু আগে নেমে এসে গাড়িতে বসে হর্ন বাজায়। অর্থাৎ যারা যাবে তাদের আসার তাগিদ দিচ্ছে। কিন্তু সকলের আগে জানলায় এসে দাঁড়ায় ওই মেয়ে। দীপু তাকালে অন্য দিকে মুখ ফেরায় কিন্তু টেরিয়ে দেখে। না তাকালে সোজা দেখে। দীপুর ভিতরের এই অনুভূতিটা একেবারে নতুন। ও গাড়ি চালায় বলে নিজের কাছে নিজের কদর হঠাৎ যেন রাতারাতি বেড়ে গেল। দীপু পর পর কদিন ধরেই লক্ষ্য করে যাচ্ছে, ও স্টিয়ারিং-এ এসে বসলে আর হর্ন বাজালেই মেয়েটা ঠিক জানলায় এসে দাঁড়াবে। যেন হর্ন বাজিয়ে ওকেই ডাকা হচ্ছে। ভাগ্যিস ছোড়দি বউদি মা এখন বিয়ে নিয়ে তন্ময়, নইলে ঠিক তাদেরও চোখে পড়ত। আবার এ-ও লক্ষ্য করেছে, বাড়ির লোক গাড়িতে উঠে বসার আগে এক-এক সময় সরেও যায়। না, মেয়েটাকে দীপুর বোকা মনে হয় না একটুও।

ছোড়দির বিয়ে এসেই গেল, আর দিন নয়-দশ বাকি। এখন নেমন্তন্ন করার পর্ব চলছে। সকালের দিকে ফণী ছাদের ঘরে এসে খবর দিয়ে গেল বাবু তাকে একতলার ফ্ল্যাটে ডাকছে।

একতলার ফ্ল্যাটে কেন দীপু ভেবে পেল না। নেমন্তন্নর লিস্টে

মিত্তির সাহেবের নাম দেখেছে। তিনজন ধরা হয়েছে, ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আর মেয়ে। বাবা যদি সেই নেমন্তন্ন সারতে গিয়ে থাকেন তাহলে ওর ডাক পড়ার কারণ কি ?

দীপু নেমে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। হাফ প্যাণ্ট পরনে ছিল। সেটা বদলে একটা ফর্সা পা-জামা পরে নিল। গায়ে গেঞ্জির ওপর সার্ট চড়ালো। দেয়ালে ঝোলানো ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়ালো। যতটা স্মার্ট আর মিষ্টি লাগছে নিজেকে সত্যিই ততটা কিনা দীপুর সন্দেহ আছে।

নিচের এই দৃশ্য দীপুর কল্পনার মধ্যে ছিল না। বড় টেবিলের তিন দিকে বসে আছে বাবা, একতলার নতুন ভাড়াটে মিত্তির সাহেব আর তার ভীষণ-ফর্সা আর ভীষণ রোগা স্ত্রী। টেবিলের ট্রেতে চা কেক। বাবা ওগুলোর সদগতি করছে বেশ। অন্য তুজনের হাতেও চায়ের পেয়ালা, টেবিলের ওপর ছোড়দির বিয়ের চিঠি। ভিতরের দরজার কাছে তাদের ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে। দীপু ঘরে ঢুকতে সেই মেয়ে সোজা তাকালো একবার। দীপুর মনে হল তার মুখে চোখের হাসির ঝাপটা লাগল একপ্রস্থ। একই সঙ্গে নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হতে লাগল দীপুর। স্মার্ট হওয়ার তাড়নায় তাড়াতাড়ি তু হাত তুলে ভদ্রলোক আর মহিলার উদ্দেশে নমস্কার জানালো।

মহিলা মাথা নাড়ল, ভদ্রলোক একটা হাত তুলে দরাজ আহ্বান জানালো।—এসো, চা খাও।

মহিলা সামনে না থাকলে বসে পড়ত, চা খেতেও আপত্তি হত না। দরজার কাছের ওই মেয়ে এখন ওকে চোখের কোণ দিয়ে দেখছে মনে হল। তাতে কেন যেন দীপুর অস্বস্তি একটু বাড়ল। বলল, আমার সকালে চা খাওয়া হয়ে গেছে, একবারের বেশি খাইনে—

বাবার একটু হাসি-হাসি মুখ। জানান দিল, ও আবার যোগ-ব্যায়াম টেয়াম করে তো, তাই নিয়মের বাইরে খুব যায় না। তারপর

ওকেই জিগ্যেস করল, তোর মাস্টারমশাই এখন সপ্তাহে কদিন পড়ান তোকে ?

দীপু এই প্রশ্ন থেকেই ওকে ডেকে পাঠানোর হদিস পেল। জবাব দিল, তিন দিন পড়ানোর কথা, তবে নিজে থেকেই আরো বেশি আসেন।

ভদ্রলোক মন্তব্য করল, দ্যাটস গুড···।

বাবা আবার ওকে জিগ্যেস করল, তাহলে বাকি তিন দিন আর অন্য টিউশনি করেন না ?

দীপু ইচ্ছে করেই একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল, টানা হেঁচড়া তো কতজনে করে, মাস্টারমশাইয়ের ভালো লাগে না।

—হোয়াই ? সঙ্গে সঙ্গে মহিলার প্রশ্ন।

এর জবাব বাবা দিলেন।—আমি তো বলেছিলাম হি ইজ্ ডিফারেণ্ট, রিজিডলি অনেস্ট, লোভ-টোভ কম। আমাদের সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক, আমার বড় ছেলেকে পড়িয়েছেন, দুই মেয়েকে পড়িয়েছেন, বছর পাঁচেক ধরে ওকে পড়াচ্ছেন। ছেলের দিকে ফিরল, শোন্ এঁরা সেশনের মাঝামাঝি সময় এসে পড়েছেন, এঁর মেয়ের জন্য একজন কোচ দরকার, উনি পড়াবেন ?

দরজার দিকে না তাকিয়ে দীপু মিত্তির সাহেবকে জিগ্যেস করল, কোন্ ক্লাস ?

বাপের আগে ওদিক থেকে মেয়ে জবাব দিল,—নাইন !

দীপুর দু চোখ আস্তে আস্তে এবার ভিতরের দরজার দিকে ফিরল।—ইংলিশ মিডিয়াম না বাংলা ?

—ইংলিশ।

দীপুর কেন যেন আপনা থেকেই চোখ ফেরাতে হল। মিসেস মিত্র এবারে অনুরোধ করল, মেয়ে ছাত্রী খারাপ নয়, তুমি দেখো না একটু বলে-টলে—

সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে প্রতিবাদ।—মা, ডোণ্ট একজাজারেট !

মেয়ের বাবা অর্থাৎ মিত্তির সাহেব হেসে উঠল।—ওকে ভালো ছাত্রী বললে ও রেগে যায়।

দীপু বাবাকে বলল, রাতে এলে আমি বলব'খন, তার আগে তুমিও ফোনে বলে রাখো—

মিত্তির সাহেব সৌজন্য প্রকাশ করল, থ্যাঙ্ক ইউ।

মহিলা তখুনি জিগ্যেস করে বসল, উনি রাজি হলে কি-রকম দিতে হবে ?

এবারে দীপু একটু বিব্রত বোধ করল। তার ধারণা, বাবা যা দেয় তার থেকে মাস্টারমশাইয়ের ঢের বেশি পাওয়া উচিত। বাবাও চট করে কিছু বলে উঠতে পারছে না লক্ষ্য করল। দ্বিধা কাটিয়ে দীপু স্পষ্ট জবাব দিল, বাবা ওঁকে পঁচাত্তর টাকা দেন, কিন্তু আমার সঙ্গে যা রিলেশন এক পয়সা না দিলেও উনি আমাকে পড়ানো ছাড়বেন না।··আমার মনে হয়, উনি রাজি হলে ওঁর সঙ্গেই কথা বলে নেওয়া ভালো।

এইটুকুর মধ্যে দীপু দেখে নিল ওই মেয়ে নিচের লালচে ঠোঁট একটু উল্টে চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখছে।

এদিকে মিত্তির সাহেব একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, ঠিক আছে ওর জন্য আটকাবে না, সপ্তাহে তিনদিন একশ টাকা করে দেবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। আই জাস্ট ওয়াণ্ট এ গুড টিউটর।

দীপু তার বাবাকেও একটু অবাক করে জবাব দিল, হি ইজ একসেপশনালি গুড, ইট উইল বি লাক্ ইফ ইউ গেট হিম।

দু হাত কপালে তুলে ভদ্রলোক আর মহিলার উদ্দেশে নমস্কার জানালো। মাথা ঝাঁকিয়ে ভদ্রলোক এবার হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। —থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার, ইউ আর স্মার্ট বয়, আই অ্যাম গ্ল্যাড টু মিট ইউ—কি নাম তোমার ?

—প্রদীপ বসু। থ্যাংক ইউ সার—

দীপু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। একদমে সোজা তিনতলায়

নিজের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভালো। তার্কিক ছেলে ও, সর্ব বিষয়ে কিছু না কিছু বলতে পারে। ফলে সেখানে সকলে ওকে স্মার্ট ছেলেই বলে। কিন্তু আজ একতলার ওই মেয়ের বাবার বলাটা যেন অপ্রত্যাশিত পুরস্কারের মতো কিছু।

…এত দিনেও মেয়েটার নাম জানা হল না। আজ খুব বেশি-রকম জানতে ইচ্ছে করছে। আর বাবার ফোনের অপেক্ষায় বা রাতের অপেক্ষায় না থেকে ছুটে মাস্টারমশাইয়ের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। তাকে রাজি করিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

·মেয়েটির বয়েস যদি চৌদ্দ হয়, এখন ক্লাস নাইন··তাহলে সতেরোয় হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। তার মানে বয়েসের হিসেবে দীপুর থেকে এক বছর আগে। এই হিসেবটা খুব ভালো লাগল না। ও যে কি করে একটা বছর পিছিয়ে থাকল।

সন্ধ্যার পর থেকে রুদ্ধশ্বাসে মাস্টারমশাইয়ের অপেক্ষায় ছিল। ঘরে পা দিতেই জিজ্ঞেস করল, বাবার সঙ্গে আপনার ফোনে কোনো কথা হয়েছে মাস্টারমশাই ?

জবাব দেবার আগে মাস্টারমশাই ধীরে সুস্থে খাটে বসলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে সোজা খানিক ওর দিকে চেয়ে রইলেন।—একতলার মিত্তির সাহেবের মেয়েকে পড়ানোর কথা ?

--হ্যা· ?

—তোর যেন খুব ইচ্ছে আমি পড়াই ?

দীপু থতমত খেল এক প্রস্থ। তাড়াতাড়ি বলল, না··ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রীর সামনে বাবা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন··ওঁরা বলছিলেন, বছরের মাঝখানে এসে পড়ায় মেয়ের জন্য খুব ডিপেনডেবল একজনকে ভারী দরকার···

—তোর বিবেচনায় আমি খুব ডিপেনডেবল ?

—কি যে বলেন··

—আর ওই মেয়েটা কি রকম ডিপেনডেবল ?

এই প্রশ্ন শুনে দীপু হকচকিয়ে গেল। মনে হল মাস্টারমশাইয়ের সাদামাটা চাউনির তলায় একটু হাসি চিকচিক করছে। দীপু জবাব দেবার আগেই আবার প্রশ্ন, মেয়েটাকে দেখেছিস ?

এই একটি মাত্র মানুষের এমন প্রভাব ওর ওপর যে এবারে একটু নার্ভাস ছেলের মতোই মাথা নাড়ল। দেখেছে।

মাস্টারমশাই অনেকটা যেন নিজের মনেই মন্তব্য করলে, এ থিং অভ বিউটি ইজ জয় ফর এভার। তারপরেই সশব্দে হাসি। সঙ্গে ওয়ার্নিং।—বাট্ দ্যাট্ ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার। তোর বাবার ফোন পেয়ে আর তুইও পড়াবার জন্য আমাকে বলবি শুনে আমি ওঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরেই ওপরে উঠেছি। মেয়েটা ফুটফুটে সুন্দর দেখতে বলে শুধু তোর কেন, আমারও ভালো লেগেছে—কিন্তু কথা বলে একটু পাকা মনে হল। ওর বাবা মা ওর সামনেই মাইনের কথা তুলতে আমার ভালো লাগল না। বলে দিলাম, পনেরটা দিন আগে দুজনেই দুজনকে দেখি, দুজনের দুজনকে পছন্দ হলে পরে ও-সব কথা। কাল নিয়ে বসব বলে এসেছি।

না, এই দিনেও ওই মেয়ের নাম দীপুর জানা হল না। এসেই মাস্টারমশাই যেভাবে চড়াও হলেন, জিগ্যেস করে কি করে!… মাস্টারমশাই মেয়েটাকে একটু পাকা বলে গেলেন তাইতেই দুশ্চিন্তা দীপুর। পাকা যে তাতে আর সন্দেহ কি। চোখের কোণে যেরকম করে তাকায় তাতেই বোঝা যায় দিব্বি পাকা। কিন্তু মাস্টারমশাইকেও আবার তেমনি চেনে দীপু। বেশি পাকামো দেখলে বা পড়ানোর সময় বেশি অন্যমনস্ক দেখলে সাফ জবাব দিয়ে চলে আসবেন। কিন্তু দীপু তো তা বলে মেয়েটাকে গিয়ে সমঝে দিয়ে আসতে পারে না।… লাজচে ঠোঁট ওল্টানো, সোজা তাকানো, চোখের কোণে তাকানো সবই একটু পাকামির লক্ষণ বটে…কিন্তু ঠিক ও-রকম না হলে কি মেয়েটাকে অত ভালো লাগত ?

—ধোৎ! ভালো লাগার কথা মনে হতে দীপুর নিজের কাছেই লজ্জা।

পরদিন খুব আশা করেছিল একতলার পড়ানো শেষ করে মাস্টারমশাই একবার তেতলায় আসবেন, নয়তো দোতলায় উঠে ওকে ডেকে পাঠাবেন। কিন্তু তিনি এলেনও না খবরও দিলেন না। মাঝখান থেকে সেই রাতটা দীপুর ভালো পড়াই হল না। পরের দিনটা সন্ধ্যার আগে থেকেই উন্মুখ হয়েছিল। কিন্তু গোল পাকিয়ে বসল বাবা। তক্ষুনি গাড়ি নিয়ে আর তাকে নিয়ে শ্যামবাজারে ছুটতে হবে—কয়েকটা দরকারি নেমন্তন্ন সারা এখনো বাকি আছে, আর আসার সময়ে ছেলের বাড়িতেও একবার হয়ে আসতে হবে।

দীপু না বলে পারল না।—মাস্টারমশাই আসবেন যে!

বাবার সঙ্গে সঙ্গে রাগ।—দিদির বিয়ে আর এ-সময়ে তোর মাস্টারমশায়ের আসাটা বড় হল? ফোন করে জানিয়ে দে!

অগত্যা। ওদিক থেকে মাস্টারমশাই উল্টো আরো বললেন, ক'দিন তো এখন ছোটাছুটি আছেই···এখন না-হয় থাক ক'টা দিন।

—না না না—আমার রোজ এমন কিছু কাজ থাকে না, আপনি আসবেন! দীপুর দিব্বি জোরের তাগিদ।

যাক্, সেই রাতেও ওই মেয়ের নাম জানার বা মাস্টারমশায়ের প্রথম দিন পড়ানোর ইমপ্রেশন কেমন জানা হল না। পরদিনও না, কারণ সেদিন দীপুকে পড়ানোর কথা নয়—আর বিয়ে বাড়ির ব্যস্ততার কথা ভেবেই বোধহয় একতলায় পড়াতে এসে মাস্টারমশাই দোতলায় উঠলেন না। দীপুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম।

কিন্তু তার পরদিন সকালে বেশ একটু ঝাঁকুনি খাবার মতো কাণ্ড। মা তিনখানা একশ টাকার নোট ভাঙিয়ে আনার জন্য ওকে দোকানে পাঠিয়ে ছিল। যাবার সময় দেখেছে একতলার ফ্ল্যাটের দরজা যেমন এদিক থেকে বন্ধ থাকে তেমনি বন্ধ। ওই ফ্ল্যাটে আসা-যাওয়ার পথ সামনের দিকে। এদিকের দরজা খুলে দিলে তবে এক বাড়ি, এক সিঁড়ি। সামনে নেমেও দীপু সন্তর্পণে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ছিল।

জানলায় কাউকে দেখেনি। আসার সময়েও না। সিঁড়ির কাছাকাছি এগোতেই সেই ঝাঁকুনি।

—জ্য-অ্যা-কি! ভালো করে বোঝার আগে আবারও মেয়ে-গলার কৌতুক ঝরল।

দীপু এবারে লক্ষ্য করল মাঝের দরজা ছুটো তিন আঙুল ফাঁক। ও লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে এই ফাঁকটুকু জুড়ে গেল। জ্যাকি ডাকটা শুধু মাথার মধ্যে ঝিমঝিম শব্দে ঘুরপাক খেতে লাগল।

মায়ের হাতে ভাঙানো টাকা দিয়ে দীপু কোনরকমে তিনতলায়। মাথার মধ্যে ঠাট্টার সুরটা বেজেই চলেছে। দীপু ভেবে পাচ্ছে না ওর এমন সর্বনাশটা কে করল। দাদা বউদির তো এখন নিঃশ্বাস ফেলারও ফুরসত নেই। আর ছোড়দি তো বিয়ের কনে! তারপরেই নিঃসংশয় কে হতে পারে। মাস্টারমশাই। মাস্টারমশাই ছাড়া আর কেউ না। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্তও একটু। গল্পের ছলে দাদার দেওয়া নাম বলে থাকলেও উল্টে প্রশংসাই করেছেন। তিনি কখনো কোথাও ওর নিন্দে করেন না।

·· কিন্তু কি দুষ্টু ওই মেয়ে রে বাবা! দাদার দেওয়া নামটা জেনেছে বলে এই রকম ইয়ার্কি করে বসল! ও যদি অমন হকচকিয়ে না গিয়ে তক্ষুনি বলে উঠতে পারত, হ্যালো পুসি ক্যাট— পুসি ক্যাট! নাঃ, কি-চ্ছু যদি সময়ে মাথায় আসত!

এই সন্ধের পরে মাস্টারমশাই এলেন। কিন্তু কাল বাদে পরশু ছোড়দির বিয়ে। বাড়িতে ব্যস্ততার ধুম। গোটা ছাদ মেরাপ আর ত্রিপলে ছাওয়া হয়েছে। হ্যাজাক জ্বালিয়ে তখনো লোকজন দড়ি বাঁধছে।

মাস্টারমশাই এসেই বললেন, পড়াশুনা ক'দিন এখন হবে না জানি, তোকে একবার দেখে যেতে এলাম—

দীপু ব্যস্ত হয়ে বলল, বসুন, আমি চট করে আপনার জন্য একটু চা পাই কিনা দেখি।

চায়ের নামে মাস্টারমশাই এই বোধহয় প্রথম বাধা দিলেন।—বাড়িসুদ্ধু এখন সবাই দারুণ ব্যস্ত দেখলাম—চা থাক্।

দীপু কান না দিয়ে ছুটে নেমে গেল। সোজা ছোড়দিকে গিয়ে বলল, তোর বিয়ে আর মাস্টারমশাই একটু চা পাবেন না?

তাকালেই বোঝা যায় ছোড়দির ভেতরটা এখন বেজায় খুশি। একটু মিষ্টি ভ্রূকুটি করে উঠে গেল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে দীপু চা নিয়ে তিনতলায়। মাস্টারমশাইও খুশি।—যোগাড় করেছিস তাহলে, দে—

দীপু তাঁর মুখোমুখি বসে হেসেই জিজ্ঞেস করল, একতলার ফ্ল্যাটে পড়াতে গিয়ে চা পাচ্ছেন?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে হৃষ্ট মুখে জবাব দিলেন, সেই প্রথম দিন ওঁরা মাইনের কথা জিজ্ঞেস করতে আমি শুধু চায়ের কথাটাই বলে দিয়েছিলাম, কোনরকম রিস্ক-এর মধ্যে থাকি নি।···তা মহিলা তু ঘণ্টায় তুবার চা পাঠাচ্ছেন, তারপরেও খোঁজ করেন আর চাই কিনা।

দীপুর আলোচনা খুব সহজভাবেই চালানোর চেষ্টা। জিজ্ঞেস করল, এই ক'দিনে কি মনে হল···চলবে?

—চলবে।···একটু চঞ্চল, তবে নিজের স্বার্থ বুঝে নেবার মতি আছে, আর চালাকচতুর বেশ।

আলোচনায় আচমকা এখানেই ইতি। তুজনকেই অবাক করে দিয়ে দাদার ছেলে কোলে ঘরে এসে হাজির দিদি। ছেলেকে নামিয়ে মাস্টারমশাইয়ের পায়ের ধূলো নিল।—তন্নু বলল, আপনারা তুজনেই ছাদের ঘরে, তাই চলে এলাম। আজও জ্যাকি পড়ছে ভাবিনি···

মাস্টারমশাই হেসে জবাব দিলেন, পড়ছে না, ওর রাইভালের খবর নিচ্ছে।··তা তুই তো ভারী-গিন্নি হয়ে পড়েছিস, বোনের বিয়ের তুদিন আগে মাত্র এলি—আছিস কেমন?

দীপু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, রাইভালের খবর নেওয়ার ব্যাপারখানা কি দিদি জানার ফুরসত পেল না। তু'চার কথায় ওর আর

জামাইয়ের খবরাখবর নিয়ে মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন। তার সঙ্গে নামতে নামতে দিদি ওকে ডাকল, আয়—

দিদিকে দেখে বাড়ির মধ্যে দীপুরই সব থেকে খুশি হবার কথা। খুশি হয়নি এমনও না। কিন্তু এই খুশির ব্যাপারটা আর পাঁচটা মিনিট পরে হলে কি হত! ওপরঅলা যেন রসিকতা করছে দীপুর সঙ্গে।···ওই মেয়ে ওকে 'জ্যাকি' বলে ডাকল, আরও কিনা তার নামটাই জানতে পারল না এখন পর্যন্ত!

ছোড়দির বিয়ের লগ্ন একেবারে সন্ধ্যায়। বিয়ে ছাদেরই এক ধারে হয়ে গেল। মেয়ে জামাইকে নিচে নিয়ে যেতে খাওয়ার তোড়জোড়।

দীপু লক্ষ্য রাখছে। দ্বিতীয় ব্যাচে একতলার মা আর মেয়ে এলো। মেয়েদের দিদি আর বউদি ডেকে এনেছে।···দীপু খানিক দূর থেকে দেখছে। এক-এক ব্যাচে কম করে একশর ওপর বসার জায়গা। এই দ্বিতীয় ব্যাচে আর একটাও জায়গা খালি নেই। কিন্তু দীপু দেখছে কেবল একজনকেই। আজও দেখার মতো বলেই দেখছে। সাবানের ফ্যানার মতো ধপধপে সাদা ফ্রক। নিচের দিকটা ঘাগড়ার মতো একটু ছড়ানো। ওপরটা টাইট। কাঁধের নিচে ছোট হাতা। কি কাপড়ের কি ফ্রক দীপুর ধারণা নেই। গায়ের সাদা রঙের সঙ্গে ওই সাদা মিলেমিশে এমন অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে যে দীপুর মনে হচ্ছে যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যের মেয়ে।

দীপু সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তার চেনাজানার মধ্যে তিন-চারজন মেয়ে পুরুষ ওই দিকটায় বসেছে। পরিবেশন করার ব্যাপার কিছু নেই। দাদার সাহেবী ব্যবস্থা। কেটারারের লোকেরা পরিবেশন করছে। বাড়ির লোকের আর নিকট আত্মীয়দের কেবল ঘুরে ঘুরে তদারকির দায়িত্ব। কিন্তু দীপুর যেদিকে তদারকে যাবার ইচ্ছে, বউদি সরে না গেলে সেদিকে যায় কি করে? দিদি আগেই

চলে গেছে। ফ্রাই মাছ মাংস শেষ হয়ে যখন চাটনি পড়েছে, বউদি নিচে নেমে গেল। মাসি-টাসি আর যারা ওদিকে আছে দীপুর কেয়ার করার দরকার নেই। এতক্ষণ ধরে বউদির ওপর দারুণ রাগ হচ্ছিল। ওই মেয়ে যে অনেকবার চোখের কোণ দিয়ে দূরে দাঁড়ানো দীপুকে লক্ষ্য করেছে তা-ও নজর এড়ায়নি। এবারে হন্তদন্ত হয়ে দীপু সেই দিকে গেল। চেনাজানা মুখদের একবার খালি জিগ্যেস করল কি চাই। তারা জবাব দিল কি দিল না তা-ও কানে গেল না। তারপর একতলার মহিলা সামনে। মাসিমা, কিছু খাচ্ছেন না তো কি দিতে বলব?

মহিলা হেসে জবাব দিল, কিছু না, অনেক খাচ্ছি।

একটু সরে দীপু এতক্ষণে তার লক্ষ্যে।—কি দেবে?

ওই মেয়ে আস্তে আস্তে সোজা হল একটু। ছোট ছোট ঝকঝকে দাঁতে করে আস্তে আস্তে চিবুচ্ছে কি। ঠোঁটে টিপটিপ হাসি। চোখেও। সামান্য মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, কিছু না।

—সে হবে না ফ্রাই দিক দুখানা?

—ফেলা যাবে।

সোজা তার দিকে চেয়ে নেই, একটু কোণাকুণি চাউনি যা দীপুর এ কদিনে সব থেকে ভালো লেগেছে।

—তা হলে ভালো দেখে মাছ দিক আর একখানা?

—ফেলা যাবে।

দীপু এবারে ওর ডিশের দিকে তাকালো। দেখল চাটনির অর্ধেকটা খাওয়া হয়েছে।

—তাহলে আর একটু চাটনি দিক?

—ফেলা যাবে।

এবারে ওর মা বলল, ফেলা যাবে ফেলা যাবে করিছস কেন, কিছু দরকার নেই বলতে পারিস না?

মায়ের দিকে মেয়ে তাকালোও না। ঠোঁটে হাসি আর হাসি-ছোঁয়া দু চোখ বেঁকিয়ে দীপুর দিকেই চেয়ে আছে। দীপু এতক্ষণ

কাছে আসার জন্য ছটফট করছিল, এবারে সরে গিয়ে বাঁচল। কিন্তু দূরে গিয়েও আরো কতবার চোখোচোখি হল ওই মেয়ের সঙ্গে ঠিক নেই। বোকার মতো সোজা তাকিয়েছে শুধু দীপুই। আয়নার সামনে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অভ্যাস করলেও অমন তেরছা করে তাকাতে পারবে কিনা সন্দেহ। যতো তেরছা ততো যেন মিষ্টি।

বিয়ে শেষ। এক দিন বাদ দিয়ে বউভাত শেষ। দু'দিন বাদে জামাইয়ের ধুলো-পা করা শেষ। তারপর বাড়িখানা হঠাৎ যেন একেবারে নিঝুম। দিদি এই সকালেই চলে গেছে। দীপু নিজে গাড়ি চালিয়ে দিদি আর বাসুদাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে এসেছে। এ সপ্তাহটাই আর স্কুলে যাবে না ঠিক করেছে। দুপুরে মায়ের ঘরে মা, বউদির ঘরে ছেলে নিয়ে বউদি। বউদির দিবা নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় না, ছেলের জন্য বাঁধা ঝি আছে। তার চারচারটে দিন দিবা-নিদ্রা বাদ গেছে। বাবা ক'দিন কামাইয়ের পর আজই কাজে গেল। দাদা তো গত পরশু থেকেই অফিস করছে।

এত হৈ-চৈ উৎসবের মধ্যেও যেমন, এই নিঝুম নীরবতার মধ্যেও তেমনি—দীপুর মাথায় কেবল এই এক মেয়েই ঘুর-পাক খেয়ে চলেছে। আজও যার নামটা পর্যন্ত জানে না। থেকে থেকে মনে হচ্ছে এ যেন এক রূপকথার নাম-না-জানা মেয়ে—আধা স্বপ্ন আর আধা সত্যের মধ্যে ওর সমস্ত অস্তিত্বটুকু কেড়ে নিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ একটা ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো করে দীপু বিছানায় উঠে বসল। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করবে কি করবে না? এটা স্বপ্ন না সত্যি? সত্যি, কারণ দীপুর কপালে ঘাম দেখা দেবার উপক্রম।

কেউ একজন সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠেছে। তার পরণে সাদা-গোলাপী স্কার্ট-ফ্রক। গোলাপী ব্লাউজ, নিচে সাদা স্কার্ট। সিঁড়ির দরজা দিয়ে একবার এ-ঘরের দিকে চোখ চালিয়ে সোজা ছাদে চলে গেল।

দীপু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। একেবারে বুকের হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগার মতো সত্যি। ছাদের রেলিং-এ বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে মেয়ে নিচের রাস্তা দেখছে। হাঁটুর নিচে থেকে স্যাণ্ডাল-পরা পা দুটো দেখা যাচ্ছে—সেই পা ফ্রকের মতো সাদা না স্কার্টের মতো গোলাপী ঠাওর করতে পারছে না। দুইয়ের মাঝামাঝি। গোলাপী স্কার্টের যেমন দুই খাটো হাত, তেমনি সাদা-গোলাপীতে মিশেল দুই পুষ্ট বাহু ওটুকু কামড়ে ধরে আছে। সব ভুলে ওই কটা মুহূর্তের জন্য দীপুর চোখে কেবল সাদা-গোলাপীর ঘোর।

রাস্তা দেখা হল। আস্তে আস্তে সোজা হল। আরো সময় নিয়ে এদিকে ঘুরল। দু চোখ সোজা দরজার দিকে দীপুর মুখের ওপর। ওই কার্নিশেই অল্প করে ঠেস দিল। প্রায় উদাস দু চোখে দীপুর পাশ ঘেঁষে আকাশের দিকে উঠল।

ঘোর কেটে গিয়ে দীপু আবার বাস্তবে আছাড় খেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চায় না।—এ কি···এই ইয়ে মানে ছাদে যে?

ওর মুখের দুরবস্থাটুকু মেয়ে বেশ আয়েস করে লক্ষ্য করল। তারপর খুব নিরাসক্ত জবাব।—ছাদে উঠতে ইচ্ছে করল। ছাদে ওঠার জন্য যদি আলাদা ভাড়া লাগে বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিও। আমার ধারণা, এ-বাড়িতে যখন থাকি তখন এ-বাড়ির ছাদে ওঠার রাইটও আমাদের আছে।

কি মেয়ে রে বাবা! জ্যাকি বলে ডেকেছিল। এখনো ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার জন্য বলল, তুমি সত্যি একলা এলে না মাসিমা দোতলায় মার কাছে এসেছেন আর তুমি তিনতলায় চলে এসেছ?

রেলিং-এ ঠেক দেওয়া ওই মেয়ের মুখ সোজা দীপুর মুখোমুখি নয়, কিন্তু নির্লিপ্ত দুচোখ ওর মুখের ওপর।—মাসিমা কে?

—ইয়ে···তোমার মা।

—আমার মা তোমার মাসিমা হল কবে থেকে?

—তাহলে কি বলব···?

চোখ দুটো এবারে সোজা হল। সোজা হয়ে ওর চোখে। টিপটিপ হাসি। কিছু দুষ্টুমির জবাব দিতে গিয়েও দিল না। বলল, না, মা ঘুমুচ্ছে।

—তাহলে তুমি উঠে এলে, কি করে?

—ভিতরের দরজা খুলে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। তারপর বাঁক নিয়ে সেই সিঁড়ি ধরেই তিনতলার ছাদে।

দীপুর বুকের তলায় ধুকপুকুনি।—ইয়ে মা-মানে কেউ দেখল?

—দেখলেই বা। আমি চুরি করতে এসেছি না তোমাকে খেতে এসেছি?

দীপু কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি মেয়েটার! তারপরেই মনে পড়ল এখন পর্যন্ত নামই জানে না।—তোমার নাম কি?

জবাব দিতে এক মুহূর্ত সময় নিল। গম্ভীর।—প্রিয়া।

—প্রি-প্রিয়া!

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি। জোরে শব্দ করে নয়। সেই হাসিতে মুক্তোর মতো দাঁতের সারি দেখা গেল, আর লালচে দুই ঠোঁটের ভেতরটুকু।—আমার নাম মঞ্জু—মঞ্জুলা থেকে মঞ্জু—তুমি যেমন প্রদীপ থেকে দীপু।

এ কি বেপরোয়া মেয়ে—দীপু একে নিয়ে এখন কি করে! ঘেমেই উঠছে।—চলো, নিচে গিয়ে মায়ের ঘরে বসি—

সামান্য ভ্রূ-ভঙ্গি।—তোমার মা এই ভর দুপুরে আমার জন্যে জেগে বসে আছেন?

—না···ঘু-ঘুমিয়েই আছে বোধহয়।

ওর এই বেহাল দশাটাই যেন সব থেকে উপভোগের বিষয় মেয়েটার। হাসি-মাখা দু চোখ ওর মুখখানা আর একদফা নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর আবার হাসি।—তুমি অত সুন্দর গাড়ি চালাও কি করে?

কি বলতে চায় ঠিক বুঝল না।—কেন?

—বাবা বলে, কলকাতায় যারা সাহস করে গাড়ি চালায় তারা পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় গাড়ি চালাতে পারে—তুমি তো দেখি রাম ভীতু!

এবারে দীপু বুদ্ধিমানের মতো একটু জবাব দিয়ে উঠতে পারল। বলল, রাম কি কখনো ভীতু হয়?

আবার হাসি।—হয়, এই রাম হয়··মাস্টারমশায় অবশ্য বলেন, দেখতে হাবা হলেও চালাকচতুর খুব—

—মাস্টারমশাই এ-কথা বলতেই পারেন না।

—কি বলতে পারেন না?

—দেখতে হাবা। তোমার বাবাও প্রথম দিনই আমাকে স্মার্ট বয় বলেছিলেন।

—উঃ! খুব যে। একটু আগে তো কাঁপছিলে!

সত্যি কোন্ জাদুতে যেন সংকট ভুলে ছিল কয়েক মুহূর্ত। ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত আবার। আমতা আমতা করে বলল, না···কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে তাই ভাবছিলাম···

এমন দুশ্চিন্তা দেখতেই মেয়েটার যেন বেশি মজা।—কি ভাববে? আমরা ভাবার মতো কি করছি?

দীপুর কান গরম হওয়ার দাখিল। বিপাকে পড়ার ফলেই মগজ একটু সাফ হল। নরম করে বলল, তুমি ছোট মেয়ে তো, ঠিক বুঝবে না···!

শোনামাত্র দু চোখ বড় হয়ে উঠে দীপুর মুখের ওপর আছড়ে পড়ল। ওকে তাতিয়ে দেবার মতো বুদ্ধি আছে ছেলেটার মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না! তবু ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, বয়েস কতো?

—আমার? তা কম কি, আর কয়েক মাস বাদে সতেরো ছাড়িয়ে আঠেরোয় পড়ব···তোমার?

—আর কয়েক মাস বাদে একান্নয় পড়ব।

দীপুর ভালো লাগল কিন্তু ধোঁকা খেল না। অর্থাৎ আর কয়েক মাস বাদে চৌদ্দ ছাড়িয়ে পনেরোয় পড়বে। তাই পনেরো উল্টে একান্ন বলেছে। দীপুও একটু ঠোঁট উল্টে বলল, তাহলে তো যা ভেবেছিলাম তার থেকেও ছোট—তিন বছরের ছোট মানে থ্রি-সিক্সটিফাইভ ইনটু থ্রি ইজ ইকোয়াল টু···তিন পাঁচে পনেরোর হাতে এক···তিন ছত্তিরিশে একশ আট আর একে নয়···হল গিয়ে হাজার পঁচানব্বুই দিনের ছোট আমার থেকে··বোঝো একবার—

এই বয়সের ছেলেকে এমন স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালাতে দেখেই ভারি স্মার্ট মনে হত মঞ্জুর। মুখ খুলতে সেই স্মার্টনেসের লক্ষণ আরো বেশি দেখছে। কিন্তু সে-ও মেয়ে কম নয়। তেরছা করে তাকালো আবার।—বুঝেছি, ঠাকুরদা-নাতনী সম্পর্ক প্রায়—তাহলে আর অত ঘেমে উঠছ কেন?

দীপুর মুখে আবার বিপন্ন ছায়া। কটা বাজে কে জানে, বাবা সাড়ে চারটে পাঁচটার মধ্যে ফিরবে, মা চারটেয় দরজা খুলে দেবে ঝাড়া মোছার ঝি-টার জন্য। বউদির অবশ্য ঘুম ভাঙতে এমনিতেই বিকেল গড়ায়।

হাসির শব্দে সচকিত।—নাঃ, মাস্টারমশাই যতই তোমার প্রশংসা করুক, আসলে তুমি রাম ভীতু!

কৌতূহল সত্ত্বেও দীপু নিস্পৃহ সুরে বলল, মাস্টারমশাই আবার কি প্রশংসা করেন, আমি তো জ্যাকি···তুমি নিজেও সেদিন ওই নামে ডাকলে।

সুন্দর মুখের খুশি ঝরা দেখতেও কি মিষ্টি। জবাব দিল, তোমার দিদির বিয়ের আগে তোমার অত মাতব্বরি দেখে গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। মাস্টারমশাই অবশ্য তোমার জ্যাকি নামের গল্প বলতে গিয়ে প্রশংসাই করেছিলেন। বলেছিলেন, ওই জ্যাকি একদিন কি ছেলে

হবে দেখে সকলের তাক লেগে যাবে।···তোমার নাকি অনেক ভালো ভালো বই আছে? ওই ঘরেই?

দীপু মাথা নাড়ল। মনে মনে ভাবছে মা বা কেউ যদি দেখেই ফেলে তো বলতে হবে, অমন মস্ত ছাদ দেখে ছুটোপুটি করার লোভে যদি উঠেই পড়ে ও কি করবে! মঞ্জু প্রায় ছুটেই ওই ঘরে গিয়ে ঢুকল। দীপু তার পিছনে। এমন বাস্তবের ধাক্কায় আসলে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। আবার এমন লোভনীয় সঙ্গ জীবনে এই প্রথম তাও অনুভব করছে। টেবিলের টাইম পীস-এ বেলা মাত্র তিনটে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ছাদে ঢোকার সময় মঞ্জু খাটটা দেখেছিল, পরিপাটি শয্যা ততো লক্ষ্য করেনি। এ-ঘরে সবই পরিচ্ছন্ন। বিছানার দিকে চোখ পড়তে মঞ্জু থমকালো একটু।—এ-ঘরে পড়ো আবার রাতে এখানেই ঘুমোও?

মাথা নেড়ে দীপু বিস্ময়ের হেতু বুঝতে চেষ্টা করল।

—ছাদের ঘরে একলা শুতে ভয় করে না?

—রাম-ভীতুদের ভয় করে না।

জব্দ। আবার খুশিও। সেলফ থেকে, দেয়ালের তাক থেকে ইচ্ছেমতো বই টেনে টেনে খুলে দেখে সশব্দে টেবিলের ওপর ফেলতে লাগল। এটা দীপুর একটুও ভালো লাগল না। এখানকার বই অমন বে-দরদী ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়। দীপুর মনে হল বইগুলোর গায়ে ব্যথা লাগছে।

—এ মা! এ-সব কি বই? এ-যে দেখি বেজায় সীরিয়াস ব্যাপার সব—তুমি খুব সীরিয়াস ছেলে নাকি?

—দারুণ। দীপু গম্ভীর।

মঞ্জুও তেমনি সেয়ানা। বলল, ভালোই হল। আমার আবার সীরিয়াস ছেলেদের পিছনে লাগতে খুব ভালো লাগে।

—তোমার মতো অত সুন্দর মেয়েরা লাগলে আমারও ভালো লাগে।

হাতের বইটা দিয়ে সোজা মাথায় হাল্কা এক-ঘা বসিয়ে দিল, বেশ তো কথা ফুটেছে, বুকের ধুকপুকুনি কমেছে ?

এই মেয়ের সঙ্গে প্রথম দিন কথা বলে মাস্টারমশাইয়ের নাকি একটু পাকা মনে হয়েছিল। বাপরে বাপ, কি পাকা, কি পাকা। দীপুর ভাবনা-চিন্তা অর্থাৎ মনের বয়স ওর বয়সী ছেলেদের থেকে অনেক বেশি বলেই বিশ্বাস। কিন্তু এই এক দুপুরের খানিকক্ষণের মধ্যেই ওকে কাঁচা বানিয়ে ছেড়েছে।

আর কি-ভালো যে লাগছে তা চোখ দিয়ে কান দিয়ে মন দিয়ে শুধু অনুভব করাই যায়।

চিলড্রেনস লাইব্রেরির একটা ভলিয়ুম উল্টেই দেখল অনেক রং-চঙে ছবি। বইটা নিয়ে ধুপ করে খাটে শুয়ে পড়ল। বইটা চোখের সামনে খুলে ধরল।

সব ভুলে দীপু এখন হাঁ করে রূপকথার কোনো মেয়েই দেখছে বুঝি। অল্প কোঁকড়া চুলের গোছা বালিসের দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শোবার ফলে স্কার্টটা ইঞ্চিকতক উঠে আসতে হাঁটুর ওপর দিয়ে মোমের মতো দুই সাদা উরুর খানিকটা করে দেখা যাচ্ছে। বুকের দিকটায় প্রকৃতির কিছু নতুন কারিকুরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। দীপু স্থানকাল ভুলে যাচ্ছে খেয়াল নেই।

হঠাৎ বিষম সচকিত। বইটা ওই মেয়ের চোখের সামনে খোলা বটে, কিন্তু একবর্ণও পড়ছে না—চাউনিটা বেঁকিয়ে ওর মুখের ওপর ফেলে রেখেছে। ওকেই দেখছে। চোখাচোখি হতে খিলখিল করে হেসে উঠল। বইটা বিছানায় ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে উঠে পা ঝুলিয়ে বসল।—তুমি একটা জোচ্চোর !

দীপু মিনমিন করে জিগ্যেস করল, কি করলাম ··।

—কি কর-লা-ম ! মিষ্টি ভেঙচি সঙ্গে মিষ্টি হাসি। শরীরে একটু ছোট ঝাঁকুনির তরঙ্গ তুলে উঠে দাঁড়ালো।—কাল স্কুলে যাচ্ছ ?

প্রশ্নের কারণ না ভেবে দীপু জবাব দিল, এই তিন চারদিন আর যাচ্ছি না, খুব খাটা-খাটনি গেছে।

—ভালোই হল। আজ চলি, কাল আবার আসব।

দীপু আঁতকেই উঠল, কা-কাল মানে কখন?

—এই সময়েই তো সুবিধে, তোমার কখন ইচ্ছে?

—না ··মানে কাল তোমার স্কুল নেই?

—না, ছুটি।

—কাল কিসের ছুটি?

—গ্রীষ্মের।

দীপু হাঁ।—আগষ্ট মাসের শেষে গ্রীষ্মের ছুটি।

—তাহলে বোধহয় বর্ষার, কিংবা শীত আসছে বলেও হতে পারে।

নাঃ এই পাকা মেয়ের মুখোমুখি দীপু কিছুই নয়। মঞ্জু হাসছে। —আমি তোমার এত খবর জানি, আর তুমি তো খুব খবর রাখো দেখি আমার। বছরের মাঝখানে সেই নর্থ-এর স্কুল ছাড়লে এখানকার কোনো স্কুলে এ সময়ে ক্লাস নাইনে আমাকে নেবে? মাস্টারমশাই আমাকে বাড়িতে পড়াবে তারপর পরীক্ষার সময় আমি আমার সেই পুরনো স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে আসব, বাবা সেই ব্যবস্থা করল না?

দীপু অত আর জানবে কি করে। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে মঞ্জু ব্যস্ত হল।—যাই বাবা. সাড়ে তিনটেয় আজ গানের টিচার আসার কথা।

ঘর থেকে বেরিয়ে তর তর করে নেমে গেল। অনেক পিছনে দীপু ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। বাঁকের কাছে উঁকি দিয়ে নিশ্চিন্ত। দোতলা নিঝুম। ওই মেয়ে চোখের আড়ালে।

তিন লাফে দীপু আবার নিজের ঘরে। এমন কিছু কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে ভিতরে যা ওর নিজের শরীরটার মধ্যে কুলোচ্ছে না। দীপুর লাফাতে ইচ্ছে করছে, গান গাইতে ইচ্ছে করছে, কোনো অজানা

স্বপ্নের জোয়ারে ভেসে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সব ইচ্ছেগুলোই ভেতরের। বাইরে ওকে যেন অনড় বিহ্বল করে দিয়ে গেল মেয়েটা।

বইগুলো একে একে জায়গা মতো রাখল। কারো হাতের ছোঁয়া পেয়ে ওগুলোর স্পর্শও এখন অন্যরকম। স্পর্শের কথা মনে হতেই বিছানার দিকে এগোলো। ঝুঁকে মাথার বালিশের তোয়ালেটা শুঁকল। মনে হল, একটু মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ লেগে আছে। বিছানায় বসল। শুয়েও পড়ল। কিন্তু নড়তে চড়তে পারল না। ওই মেয়ের ছোঁয়াটুকু মুছে যাবার ভয়।

সেই বিকেল থেকে রাতটা কেমন বিহ্বলতার মধ্যে কেটে গেল। আঠেরো বছর হয়নি এমন কোনো ছেলে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে কিনা দীপু জানে না। ওর ভিতরে যা হচ্ছে তার নাম প্রেম কিনা তাইবা জানবে কি করে? দীপু তার নিজের ভিতরের জোয়ারে ডুবছে ভাসছে দুলছে ফুলছে। এর নাম কি?

সকালের পড়া মাথায় উঠল। দুপুর থেকে ভয়, আতঙ্ক। আবার মনে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটা যেন থেমেই আছে—নড়ছে না। দুপুর একটা থেকে ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে। দেড়টার মধ্যে তিনবার করে দোতলায় নেমে দেখে এলো মা আর বউদির ঘরের দরজা কোনো কারণে খোলা হয়েছে কিনা। একবার একতলায়ও নামল। ভিতর থেকে সবকটা দরজা টাইট বন্ধ।

পৌনে দুটো বাজতে এমন ছটফটানি যে ভাবল আজ আর এলোই না।

—দী-ই-পু!

কানের গোড়ায় কোকিল ডেকে উঠল? দীপু ছিটকে খাট থেকে নেমে ছাদের এদিক ওদিক তাকালো। তারপরেই চক্ষু স্থির। মঞ্জু স্পাইরাল স্টেয়ারের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সন্ত্রাসে দীপু চাপা গলায় বলে উঠল, ওটা দিয়ে উঠে এলে নাকি!

—উঠলাম তো, দারুণ মজা লাগল। কথায় সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ছাদে।

দীপুর ভয় যায় না।—কেউ দেখে ফেলেনি তো?

লালচে ঠোঁট উল্টে দিল, কে জানে, আমি দেখতে গেছি—ঘুরে ঘুরে উঠতে গিয়ে মাথায় এমনিতেই চক্কর লাগছিল।

দীপু ওদিকের কার্নিসের কাছে গিয়ে একবার দেখে নিল। যদিও ওই গলির ভিতর থেকে এসময় কারো দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তবু দেখে নিশ্চিন্ত। কাছে এসে চট করে পাশ থেকে মঞ্জুকে দেখে নিল একবার। আজ সাদা স্কার্টের ওপর গাঢ় নীল টাইট ব্লাউজ পরেছে। কি-যে সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটা কি জানে? দীপু একটু সহজতার আড়ালে লোভের প্রশ্রয় না দিয়ে পারল না। মঞ্জুর হাত ধরে নিজের ঘরে এলো। খাটে বসালো। এটুকুতেই তার হাত ঘেমে উঠেছে। কিন্তু মঞ্জু খেয়ালও করল না। বলল, ভারী মজার তোমাদের ওই লোহার সিঁড়িটা। তুমি ওটা দিয়ে ওঠা-নামা করোনা?

ওই সিঁড়িটা বন্ধু রতনের আর ওর কত রকমের অ্যাডভেঞ্চারের সাক্ষী দীপু সোৎসাহে সেই গল্প ফেঁদে বসল। বেশ আগ্রহ ভরে শোনার পর মঞ্জু প্রস্তাব করল, ওই সিঁড়ি বেয়ে আমি তাহলে একদিন রাত্তিরে তোমার ঘরে চলে আসব, কেউ টেরও পাবে না—

—না না না না, দীপু আঁতকে উঠল, তোমার মাথা খারাপ নাকি!

মঞ্জুর চোখেমুখে হাসি উছলে উঠছে। একটু আড় হয়ে বসে চোখ বেঁকিয়ে দীপুকে দেখছে।—তোমার মতো ভীতু ছেলে আমার একটুও ভালো লাগে না।—আর আসবই না—যাও!

আসবে না শুনে দীপু চোখে অন্ধকার দেখল। বলল, আমি একটুও ভীতু নই, একলা ছাদে শুই শুনে তুমিই তো অবাক হয়েছিলে ···দুবেলা যোগব্যায়াম করি, গায়ে কত জোর রাখি জানো—

বাধা পড়ল। উঁ! ওই ঢ্যাঙা ছিপছিপে চেহারা, আমাকে দুহাতে মাথার ওপর তুলতে পারো—বুঝি কেমন জোর?

জোর দেখাবার এমন লোভ পৃথিবীতে কোনো ছেলে ছাড়তে পারে? দীপু উঠে এলো, হাত ধরে টেনে মঞ্জুকে মাটিতে দাঁড় করালো। তারপর চোখের পলকে ওর দুই বগলের তলায় দুহাত রেখে সোজা মাথার ওপরে তুলে ফেলল।

মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওর চুলের গোছা সামনে দিয়ে দীপুর মুখের ওপর। দীপু ওকে শূন্য থেকে নামিয়ে ধুপ করে খাটে বসিয়ে দিল। মঞ্জু হাসছে।

—তোমার গায়ে জোর আছে স্বীকার করলাম, কিন্তু তবু তুমি ভীতু।

হাসছে দীপুও। কিন্তু নামিয়ে দেবার পর এখন ওই মেয়ের শরীরের স্পর্শ আর চুলের স্পর্শ যে-ভাবে ছেঁকে ধরে ওকে অবশ করে দিচ্ছে তাতে মনে হয় কাজটা ভালো করেনি···আগে এরকম হলে মেয়েটা নির্ঘাৎ পড়ে যেত।

গায়ের জোর দেখেই মঞ্জু অত খুশি কি না জানে না। বলল মাস্টারমশাই ফাঁক পেলেই তোমার দারুণ প্রশংসা করেন, তুমি নাকি পৃথিবীর অনেক খবর রাখো, অনেক জানো—

দীপু জবাব দিল, আমি তো বই পড়ে জানি—আর তুমি তো জাহাজে করে তিনবার পৃথিবী ঘুরেছ।

—আমি···? তিনবার? তোমাকে কে বলল?

—বউদিকে তোমার মা বলেছিলেন।

—মা তিনবার ঘুরতে পারে, দিদিরাও কেউ কেউ দুতিনবার ঘুরেছে—কিন্তু আমি মাত্র একবার সেই পাঁচ বছর বয়সে—কি দেখেছি আর কোথায় গেছি কিছু মনেই নেই।

দীপু এরপর নিজের কেরামতি দেখাতে চেষ্টা করেছে। মস্ত ম্যাপ বই খুলে জলপথে কি করে পৃথিবী ঘোরা যায় তার হদিস বার

করতে চেষ্টা করেছে। কখন সামনে ম্যাপ, আর ওরা দুজন পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়ে আধখানা করে পা খাটের বাইরে রেখে ম্যাপে তন্ময় হয়েছে খেয়াল নেই। কাঁধে একবার কাঁধ ঠেকতে দীপুই শুধু সচকিত হয়েছে, কিন্তু ও-মেয়ের হুঁশও নেই। ম্যাপ দেখতে দেখতে আর নদী পর্বত সমুদ্র বন জঙ্গলের কথা শুনতে শুনতে শেষে বলে উঠেছে, দাঁড়াও, আরো বড় হয়ে আমরা এসব জায়গায় ঠিক যাব।

দীপুর দু-কান সজাগ।···আমি যাব বলেনি বলেছে আমরা যাব।

পরদিনও আবার আসবে বলে গেছে।

দীপুর সেই উৎকণ্ঠা। সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার শেষ হয়েছে। এসেছে। আসামাত্র দীপুর সশঙ্ক প্রশ্ন।—কেউ দেখেনি তো?

—দেখেছে!

দীপুর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।—কে দেখেছে?

—বাবা।

—বাবা! বাবা তো বাড়ি নেই!

—তোমার বাবা কে বলেছে, আমার বাবা!

দীপু তাতেও ঘাবড়ালো একটু।—তিনি কিছু বললেন না?

—এ কি তোমাদের বাড়ি যে বলবে—আমাদের বাড়িতে কেউ কিছু বলে না। বলবে কি—আমার বাবা আর মা প্রেম করে বিয়ে করেছে, আমার চার দিদি প্রেম করে বিয়ে করেছে—আমিও প্রেম করে বিয়ে করব জানা কথাই। তারপরেই একটু ঘোরালো চোখে তাকালো।—তুমি প্রেম করতে জানো?

দীপু একটু ঘাবড়ালো। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না।

—এ-মা, তুমি এত জানো আর প্রেম করতে জানো না?

দীপু ফাঁপড়ে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, এ-সম্পর্কে কোন বই-টই আছে?

হি-হি করে হেসে মঞ্জু ওর বিছানায় শুয়ে হেসে গড়ালো খানিক। —তুমি বই পড়ে প্রেম করা শিখবে!

—তাহলে ··?

একটু স্থির হয়ে চোখ বেঁকিয়ে ওকে দেখছে।—এদিকে এসো।

দীপু উঠে এলো।

মঞ্জু খাটের ধারে শুয়েই আছে। হাত দিয়ে পাশটা দেখিয়ে দিল।—এখানে বোসো।

বসল।

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুও উঠে বসল। তারপর চট করে দুহাতে ওর ঘাড়ের পিছনটা ধরে মাথা সুদ্ধ টেনে এনে মুখে চুমু খেল। প্রথমে ছোট করে। তারপর লালচে ঠোঁট ওর ঠোঁটে ঘন করে চেপে দ্বিতীয় দফা চুমু খেয়ে ছেড়ে দিল। একটা হাত দিয়ে ঠেলে ওকে মাটিতে নামালো, ওখানে গিয়ে বোসো, বেশি শিখতে চাইলে কামড়ে রক্ত বার করে দেব।

দীপু কোনরকমে চেয়ারটায় এসে বসল। শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়েছে।

মঞ্জু চোখ বেঁকিয়ে আবার ওর দিকে চেয়ে বলল, তা বলে ভেব না আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি।

—তবে···? দীপুর গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না প্রায়।

—ছোড়দি আর মেজদিকে বিয়ের আগে ওদের বরদের লুকিয়ে লুকিয়ে চুমু খেতে দেখেছি, সেই তখন থেকেই ভেবে রেখেছিলাম কাউকে পেলে চুমু খেতে কেমন লাগে দেখব—আজ দেখলাম।

—কেমন লাগে? প্রশ্নটা দীপুর গলা দিয়ে আপনি বেরিয়ে এলো।

নাক মুখ একটু সিঁটকে জবাব দিল, বিচ্ছিরি! তোমার?

—আমার কান দুটো কেমন গরম হয়ে গেছে আর মাথার ভিতরে কেমন হচ্ছে। কিন্তু ভালো লাগছে।···তুমি কামড়ে দেবে বললে, নইলে তোমার মতো করে আমি একটা চুমু খেলে ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম।

মঞ্জু চোখ পাকালে।—দেব ধরে এক গাঁট্টা! খবরদার আমার হুকুম ছাড়া আমাকে টাচ করবে না!

দীপু বিমর্ষ একটু। নিজে যেমন খুশি করবে আর ওর বেলায় আপত্তি। অথচ নিজেই স্বীকার করেছে, ওর সঙ্গে ভাব হওয়ার আগে চুমু খাওয়ার মতো কাউকেই পায়নি। তারপরেই উৎসুক একটু।—তোমার চার দিদিই প্রেম করে বিয়ে করেছে?

—সিওর! কিন্তু একজনও ঠিক ঠিক চুজ করতে পারেনি—আমার মতে অল অফ দেম সিলেকটেড রং পারসনস্—বাবা বলে, এক বাড়ির মধ্যে জামাইরা সব ক্লাস-ডিসটিংশন এনে দিয়েছে—আর আমাকে ঠাট্টা করে বলে, এ-ধারাটা বজায় রাখার জন্য মঞ্জু তুই কাকে ধরে আনতে পারিস দ্যাখ—।

দীপু উদগ্রীব হয়ে শুনছিল। সবটুকু মাথায় ঢুকল না। জিগোস করল, দিদিদের বর সিলেকশান ঠিক হয়নি কেন?

—দূর দূর! সব কটা ম্যাড়মেড়ে। যেমন ধরো বড়দি শৌখিন মেয়ে ছিল, তার কমিউনিস্ট বর কেবল মুখের বক্তৃতায় তার সব শখ মেটাচ্ছে। মেজদির মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী বর চোখের পলকে ফড়ফড় করে নোটের বাণ্ডিল গুণে ফেলে. মেজদির কথায় ওঠে-বসেও—অথচ কালচার বলতে যা, তার কিছু যদি থাকত—আর মেজদি ওদিকে তার টাকায় তৈরি কালচারাল ক্লাব নিয়েই মেতে আছে। সেজদি স্পোর্টস ভালোবাসত, বিয়েও করল একজন স্পোর্টসম্যানকে—সেই স্পোর্টসম্যান কিনা এখন সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের চাকরিতে নাক ঘসছে। আর, ছোড়দিটা কি দেখে যে ইউ, পি'র ছেলে বিয়ে করল—অবশ্য বেশ স্মার্ট আর চালাক চতুর ছেলে, মস্ত ওষুধের ফার্মের সেলস অর্গ্যানাইজার—ছোড়দি ওই কারখানারই স্টেনোগ্রাফার ছিল—বিয়ের পরে দেখে বর কেবল রাজ্যের ওষুধের স্যাম্পল বাড়িতে জড়ো করে রাখে—তাকে ওষুধ, আলমারিতে ওষুধ, ট্রাঙ্কে ওষুধ, সুটকেসে ওষুধ, ঘরের কোণে-কোণে ওষুধের স্তূপ—ছোড়দি

সপ্তাহে দুটোর তিনটে বেশী সিনেমা দেখতে গেলে বলে, তোমার বড় হাল্কা দিকে মন যাচ্ছে—ওই ওষুধ খাও। বেশি হাসলে বলে ওষুধ খাও—বেশি গম্ভীর দেখলে বলে এই ওষুধ খাও। দুবার হাঁচলে এই ওষুধ—তিনবার কাশলে ওই ওষুধ।...ছোড়দির বিয়ে তো ভাঙল বলে, সেজদির বিয়েও টিকবে মনে হয় না।

দীপুর কাছে ভাঙা বা টেকার অর্থ খুব স্পষ্ট নয়।—কি হবে?

—ডিভোর্স হবে, আবার কি হবে!...আমি বাবা এ-রকম ভুলের মধ্যে নেই। জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটানোর মতো আর মনের মতো একজন স্ট্রং ছেলে পেলে তবে বিয়ে। দীপুর দিকে বেঁকিয়ে তাকালো আবার।—খুব সাবধান, যতই ভাব করো, ওরকম স্ট্রং না হলেই বাতিল।

ভাব দীপু সেধে করেনি। ও-ই করেছে। আর পছন্দ বলেই আজ চুমুও খেয়েছে (চুমু যে এমন জিনিস দীপু জানবে কি করে, এখনো কান-মাথা গরম)। তবু সুপারিশের সুরে বলল, আমি স্ট্রং কিনা কাল নিজেই তো দেখেছ, দুহাতে তোমাকে মাথার ওপর তুলে ফেলেছিলাম।

ভ্রূ-ভঙ্গি করে মঞ্জু জবাব দিল, কি বুদ্ধি তোমার—শুধু গায়ের জোর তো কুলি মজুরেরও থাকে—আমি বলছি বিদ্যায় বুদ্ধিতে অর্থে সামর্থ্যে রুচিতে কালচারে সব-দিক থেকে স্ট্রং বুঝলে?

মাথা নাড়া সত্ত্বেও দীপু নিজের সম্ভাবনার দিকটা একটু খতিয়ে না দেখে পারল না। নিজের বিদ্যেবুদ্ধির ওপর মনে মনে যথেষ্ট আস্থা আছে, দিনে দিনে তা বাড়বে বই কমবে না।...বিদ্যেবুদ্ধি বাড়লে অর্থ সামর্থ্যও সময়ে হবেই।...আর রুচি বা কালচার কোনো সমস্যাই নয়। সব মিলিয়ে মঞ্জু যে-রকম স্ট্রং তার থেকে বেশি ছাড়া কম হবে না দীপু। তার মানে ধরেই নেওয়া যায় মঞ্জু ওকেই বিয়ে করবে!

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে মঞ্জুই আগে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, এই রে, চারটে বাজে প্রায়—

দীপু না জিগ্যেস করে পারল না, কাল আসছো ?

একমুহূর্তে ভেবে মঞ্জু বলল, কাল তো শনিবার, বাবা রেসে যাবে—আমি উঠে এলে মা একেবারে একলা পড়ে যাবে—কাল দেড়টার পরে তুমি এসো।

দীপুর আদর্শ বোধ একটু নাড়া খেল।—তোমার বাবা রেস খেলেন বুঝি ?

—লিমিটের মধ্যে থেকে খেলে—কেন, তোমার বাবাও তো খেলে—বাবা বলেছে রেসের মাঠে তার সঙ্গে দেখা হয়।

দীপু বিমূঢ় একটু। এ-খবর জানা ছিল না। মঞ্জু ততক্ষণে অর্ধেক সিঁড়ি নেমে গেছে। দীপু উঁকি দিল। নিশ্চিন্ত। দোতলার দিবা-নিদ্রার পর্ব এখনো চলছে।

দীপু ঘরে এসে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে ছাদে এলো। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিল। দু কানের পিছনেও ঠাণ্ডা জলের হাত চাপা দিল। তারপরেই হঠাৎ নিজের ওপর রাগ। একজনের ছোঁয়া ধুয়ে গেল। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল আর কানের ভিতর দিয়ে কি-রকম গরম বেরুচ্ছিল তাই জলের কথা মনে হয়েছিল। রাগ করে গেলাসের শেষ জলটুকু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ঘরে এসে গেলাসটা রেখে শুয়ে পড়ল। তারপর মনে হল, সব ধুয়ে মুছে যায়নি। ওকে টেনে নিয়ে ও-ভাবে-চুমু খাওয়ার কথা মনে হতেই একটা উষ্ণ স্পর্শ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। যত মনে করছে, ততো বেশী।

…মাস্টারমশাইয়ের সংশ্রবে এসে দীপুর জ্ঞানের তৃষ্ণা বেড়েই চলেছিল বটে, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে ও যে আজকের দিনের আগেও অন্ধই ছিল প্রায়, এ অস্বীকার করতে পারে না। মঞ্জু যেন একটা অজানা রহস্যের পর্দা হ্যাঁচকা টানে অনেকটা সরিয়ে দিয়ে গেছে। দীপু কত কি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, এমনকি মেয়েদের নিয়েও ওর কম কৌতূহল ছিল না—কিন্তু মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে কখনো মগজ

খরচ করেনি। স্কুলের কতকগুলো মার্কা-মারা পাজী ছেলে অনেক সময় মেয়েদের নিয়ে বিদ্রুপ আর ইশারা করে। মাস্টারমশাইয়ের উপদেশ মতো দীপু বরাবরই ওদের সংশ্রব এড়িয়ে চলে—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওরা যেটুকু জ্ঞান রাখে ওর তা-ও ছিল না। বাসুদার সঙ্গে দিদির প্রেম ঠিক যে কি বস্তু ছিল তা এখন যেমন বুঝছে তখন কি সে-রকম বুঝেছিল!

পাঁচ

দীপুর জগতে রক্তমাংসের মানুষ বলতে একমাত্র মাস্টারমশাই ছিলেন। এখন আর একজন বেড়েছে। মঞ্জুলা মিত্র। মঞ্জুলা থেকে মঞ্জু ঢের ভালো। দেখতে দেখতে এই একজন ওর জগতের সবটাই জুড়ে বসছে। বইয়ের তাকে যে নির্বাক সঙ্গীরা দীপুর সান্নিধ্যে সবাক হয়ে উঠত, কাছে থেকেও তারা আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। মঞ্জু আসার আগে পর্যন্ত দীপু একখানাও নাটক নভেল পড়েনি। মাঝে মাঝে এখন সে-সবও দীপুর এই জগতে ঢুকে পড়ছে। তবে তারা স্থায়ী বাসিন্দা নয়। আসে, যায়। মাস্টারমশাই ওকে হায়ার সেকেণ্ডারির পর শরৎবাবুর বই পড়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মঞ্জু এসেছে বলে কি করে সে-সব বই আগেই এসে গেছে। এখন শরৎবাবু ছেড়ে আরো অনেকবাবুই আসছে যাচ্ছে। এমন এক রসের জগৎ থেকে মাস্টারমশাইয়ের মতো জ্ঞানী মানুষ এতদিন ওকে বঞ্চিত রেখেছিলেন বলে ভিতরে ভিতরে তাঁর ওপরেও ক্ষুণ্ণ একটু।

…ছুটির দিনের দুপুরে নিয়মিত দেখা হয় দুজনের। মঞ্জু আগের থেকে কম আসে। দীপুই বেশির ভাগ নিঃশব্দে একতলায় নেমে যায়। এটাই অনেক সুবিধে। মঞ্জু তার ঘরের দরজা খুলে রাখে। দীপু ঢুকে পড়লে দরজা বন্ধ করে দিলেই নিশ্চিন্তি। আসার সময় ওদের বসার ঘর দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লে বাড়ির কারো দেখার সম্ভাবনা নেই। আর মঞ্জু সত্যি কথাই বলেছে। ওদের বাড়িতে

এই মেলা মেশা নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। মঞ্জুর মা মিসেস মিত্র প্রথম দুই একদিন ঈষৎ কৌতুকে দীপুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেছে। দেখা হলে মঞ্জুর বাবা হেসে বার দুই মাথা ঝাঁকায় শুধু। কিন্তু এখানে এলেই তাদের সঙ্গে দেখা হবে এমন নয়। বেশিরভাগ দিনই দেখা হয় না। এক একদিন মঞ্জুর কোনো দিদি হয়তো হঠাৎ এসে যায়। বাড়িঅলার এই ছেলেটাকে চিনতে তাদেরও কারো বাকি নেই। গাড়ি চালিয়ে যেতে আসতে দেখেছে। ওদের নিরিবিলি আড্ডায় ব্যাঘাত ঘটায় না কেউ। মুচকি হেসে বা সকৌতুক একটু দেখে নিয়ে চলে যায়। বোনও সময় হলে তাদের থেকে পিছিয়ে থাকবে না এ যেন জানা কথাই। বিশেষ করে যে-বোন ওদের সব কজনের থেকে সুন্দরী।

যাকে নিয়ে এখন দীপুর এই জগৎ ভরপুর কেবল তারই মেজাজের হদিস বা খেয়ালের হদিস সবসময় পায় না। মঞ্জু অকারণে রাগ করে, অকারণে খুশি হয়। বাচ্চা মেয়ের মতো বায়না করে, জেদ ধরে। দীপু পিছু হটলে বলে, যাও, তোমার সঙ্গে হয়ে গেল। হয়ে গেল শুনলে দীপু গোড়ায় গোড়ায় চোখে অন্ধকার দেখত। এমনও হয়েছে, হয়ে গেল বলে ভিতরের ঘরে চলে গেছে। ঠায় এক ঘণ্টা বসে থাকার পরেও আর আসেনি। বিমর্ষমুখে দীপু তার তিনতলার ঘরে চলে এসেছে। তারপরেই হাঁ। বিছানায় শুয়ে মঞ্জু নিবিষ্ট মনে ওরই কোনো একটা বই পড়ছে। চোখ বেঁকিয়ে সেই হাঁ-করা মুখ দেখেই হেসে লুটোপুটি।

বাড়ির লোক কখন ওকে এই ঘরে দেখে ফেলে বা কখন সব জানাজানি হয়ে যায়, দীপুর এই ভয়টা ওই মেয়ের কাছে যেন একটা মজার ব্যাপার। ছুটির দিনের ম্যাটিনি শো-তে দুজনে মিলে এক-আধটা সিনেমাও দেখেছে। কিন্তু দীপু আগেভাগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওই সামনের মোড় পার হয়ে অপেক্ষা করবে, মঞ্জুর তাতে আপত্তি। ঝাঁঝ দেখিয়ে বলবে, তুমি একটা কাওয়ার্ড,

একসঙ্গে বেরুতে দেখলে কি হবে, তোমার মাথাটা কেটে ফেলবে ?

দীপুদের বাড়ির বাতাসই যে অন্যরকম এ বুঝেও বুঝতে চায় না। আর একদিন রাগ করে বলেছিল, তোমাকে যদি বিয়ে করি—করবই বলছি না—যদি করি—তখনো হয়তো বাড়ির ভয়ে তোমার হয়ে তুমি অন্য লোককে বিয়ে করতে পাঠাবে—

সে-রকম সম্ভাবনা কল্পনা করতে গিয়ে রাগ রসাতলে, নিজেই হেসে গড়াগড়ি। মঞ্জুর একটা খেদ অবশ্য দীপু পর পর দু'দিন মেটাতে পেরেছিল। ও প্রায়ই বলত এই বয়সে অমন সুন্দর গাড়ি চালাতে দেখেই যে-ছেলেকে ওর মনে ধরেছিল, ওকে পাশে বসিয়ে সেই ছেলে একটা দিন বেড়াতে বেরুলো না।

সেই সুযোগ একদিন নয়, পর পর দু'দিন পেয়েছিল। বউদি তিন-চার দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে। আর বাবা কনট্রাকটারির একটা নতুন কাজের ব্যাপারে দু'দিনের জন্য গেছে আসানসোল। আগে বাবা প্রায়ই এরকম বাইরে যেত। দীপুর সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যই সেটা প্রায় বন্ধ এখন। যাক, দীপুকে এরপর আর পায় কে। মঞ্জুকে পাশে বসিয়ে দুটো দিন সমস্ত কলকাতা চষেছে। মঞ্জুর সে-কি ফুর্তি ওই দুটো দিন। প্রথম দিনের পরে আনন্দের চোটে এই দ্বিতীয় দিন আবার একটা চুমু পর্যন্ত খেয়েছে দীপুকে। দীপুকেও খেতে দিয়েছে।

বাড়ির লোক বেশ একটু ধাক্কা খেল দীপুর হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট দেখে। টায়ে-টায়ে ফার্স্ট ডিভিশন। একটা ডিসটিংশন নেই, কোনো পেপারে ডিসটিংশনের কাছাকাছি নম্বরও নেই। মাস্টারমশাই পর্যন্ত এ-রকমটা আশা করেননি। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর অঙ্কে ডিসটিংশন পাবে না এ তিনিও আশা করেননি। বলেছেন, তোকে খুব বেমনা দেখছিলাম ইদানীং, কি হয়েছে···এত খারাপ হল কি করে ?

দীপু কি জবাব দেবে?

দাদার তির্যক শ্লেষ আরো গায়ে বেঁধার মতো।—কি হে জ্যাকি, কি হল?

মঞ্জু বলেছে, তোমার এত খারাপ রেজাল্ট মাস্টারমশাইও নাকি আশা করেননি।

দীপু এবারে জবাব না দিয়ে পারেনি। বলেছে, প্রেমের জন্য পৃথিবীতে কত লোক কত স্যাক্রিফাইস করেছে···আমার না হয় একটু রেজাল্টই খারাপ হয়েছে।

মঞ্জু ওমনি ফোঁস করে উঠেছে।—আমার জন্য তোমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে?

—তোমার জন্য কেন, আমার জন্যেই হয়েছে—তবে একটা কথা জেনে রেখো, হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট দিয়ে কোনদিন কারো ভাগ্য ঠিক হয়ে যায়নি।

এর পর দীপু ফিজিক্স অনার্স নিয়ে কলেজে ঢুকেছে। মাস্টারমশাইয়ের পড়ানোর পাট শেষ। সপ্তাহে তিন দিন মঞ্জুকে পড়াতে আসেন। তখন একবার করে আগে বা পরে ওর ঘরেও ঢুঁ দিয়ে যান। হায়ার সেকেণ্ডারির ঘাটতি পূরণ করার জন্য গোড়া থেকে আদাজল খেয়ে লাগতে উৎসাহ দেন। দীপুরও সেই রকমই সংকল্প।

কিন্তু দীপুর মগজের সবটাই মঞ্জু মিত্র জুড়ে বসে আছে। ফিজিক্স পড়তে পড়তে কল্পনার ধাপে ধাপে এগোতে এগোতে কখনো বিজ্ঞান বিশারদ হয়ে বসে, কখনো বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন নিয়ে আসার মতো কিছু একটা আবিষ্কার করে বসে। সেই আবিষ্কারের পিছনে নাম যশ আর অঢেল টাকা। তারপর মঞ্জুর হাসি মুখ, খুশি মুখ, প্রেমের বন্যায় ভেসে-যাওয়া মুখ।

কলেজের এই তিনবছরের অধ্যায়ে দীপু একটু বেপরোয়াও হয়ে উঠেছে। যার জন্য বউদি অন্তত টের পেয়ে গেছে কিছু। বউদি টের পেলে দাদাও টের পাবে না এ হতে পারে না। দাদা

এখন পর্যন্ত মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু বউদি বিঁধতে ছাড়ে না, বলে, একতলার ওই রূপসী মেয়ের টানে ছোঁক ছোঁক করে যখন তখন ওখানে যাস আমরা জানি না ভেবেছিস—খুব সাবধান্, বেশি আশা করলে শেষে না বুক চাপড়াতে হয়।

দীপু মনে মনে হাসে। তার বিবেচনায়, ওই রূপসী এ-বাড়িতে আসবে না এ হতেই পারে না। এলে বুক যে কে চাপড়াবে দীপুর তাও ভাবতে মজা। এদিকে দাদার চাকরির আরো উন্নতি হয়েছে। বাবার কাজের তেমনি অবনতি। তার আয় বলতে একতলার বাড়ি ভাড়া, ব্যাঙ্কের কিছু ফিক্সড ডিপজিটের সুদ আর শেয়ার মার্কেটের রোজগার। সেখানে এক অবাঙালী দোসরের সঙ্গে বাবার অনেক দিনের যোগ—মাস গেলে সেই ভদ্রলোক সাত-আটশ টাকা পাইয়ে দেয়। মোট কথা দাদার উন্নতিতে বউদির দাপট স্বাভাবিক কারণেই একটু বেশি। মা-ও এখন তার অমতে কিছু করে না। আর বাবা তো দাদা যা বলে তাই।

এই তিন বছরে মঞ্জুর খেয়াল খুশি আর মেজাজমর্জির খুব তারতম্য হয়নি। এখন বাড়িতে ও ম্যাক্সি মিনি পরে, বাইরে বেশির ভাগ সালোয়ার কামিজ। ক্বচিৎ কখনো শাড়ি। যা-ই পরুক, দীপু চোখ ফেরাতে পারে না। দীপু কেন অনেকেই পারে না। বাড়ির লোক ছেড়ে মঞ্জুও জানে না, দীপু একটা টিউশানি ধরেছে। স্কুলে তো মোটামুটি নাম ছিলই দীপুর। সেই স্কুলেরই এক ছেলের বাড়িতে ক্লাস নাইনের চারটে ছেলেকে নিয়ে কোচিং ক্লাস করে—যার বাড়ি, বাকি তিনটে ছেলেকে সেই জোগাড় করেছে। সপ্তাহে তিন দিন সায়েন্স সাবজেক্ট পড়ায়—এক-একজন কুড়ি টাকা করে দেয়—চারজনের কাছ থেকে আশী টাকা পায়। শূন্য পকেটে প্রেম তেমন জমে না এ দীপু স্কুলে পড়তেই অনুভব করত। এই আশী টাকার দৌলতে দীপু অনেক মজার কাণ্ড করেছে, অনেক খুশির জোয়ারও দেখেছে। আর এক-আধ সময় প্রায় জোর করেই চুমু

পর্যন্ত খেয়েছে—দীপু আর আগের মতো অত ভীতুটি নয় তখন।

বি এসসি পরীক্ষায় দীপু অনার্সই পেল না। পাস কোর্সে পাশ করল। ফলে এম এসসি পড়ার সীট পর্যন্ত পেল না। বাবা বিরক্তিতে একটা কথাও বলল না। জ্যাকির হাল দেখে দাদার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। বাবাকে স্পষ্ট বলল, পড়াশুনা হবে কি করে—হি ইজ আফটার দ্যাট গার্ল ডাউনস্টেয়ারস। ওর কপালে দুঃখ আছে।

মঞ্জু তখন হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে বি-এ পড়তে ঢুকেছে। ইদানীং তার একটু ঠাণ্ডা ভাব দেখে দীপু মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওকে সোজা গিয়ে বলেছে, তুমিও কি এই রেজাল্ট দেখে ঘাবড়ালে নাকি? খুব নিশ্চিন্ত থাকো, তুমি পাশে থাকলে বড় আমি হবই। আমার লাইন ব্যবসা, চাকরি নয়—বুঝলে? ওই দাদার মতো বিদ্বান লোকও একদিন আমার ব্যবসায় খাটবে দেখে নিও—চাকরি করে কেউ কোনদিন বড় হয়েছে?

মঞ্জু খুব অবিশ্বাস করেনি। তবু বলেছে, বিয়ের জন্য লোক এসে এসে বাবাকে এখন থেকেই বিরক্ত করা শুরু হয়েছে···তোমার দাঁড়াতে কত দিন লাগবে মনে হয়?

মঞ্জু এমন বলতে পারে দীপু ভাবেনি। বলে উঠেছে, যত বছরই লাগুক, তোমার মতো একজন পাশে থাকলে আমার বড় হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না—জেনে রেখো।

হ্যাঁ, দীপু স্থির বিশ্বাসেই বলেছে। সহায়শূন্য কপর্দকশূন্য কত মানুষ শুধু আত্মবিশ্বাসে আর জ্বলন্ত আশায় বুক বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোথায় উঠে গেছে তা-কি ওর জানা নেই? ওর বেলাতেই বা হবে না কেন?

কিন্তু গোড়াতেই বাদ সাধল দাদা। নিজের অফিসে একটা কেরানির কাজ ঠিক করে বসল ওর জন্য। এই নিয়ে অশান্তি। বাবা

বলল, কিছু তো আর হল না, দাদা যা ঠিক করেছে তাইতেই ঢুকে পড়্। মায়েরও তাই মত।

দীপু বাবা দাদার মুখের ওপর সে প্রস্তাব নাকচ করে দিল। বলল, ও ব্যবসার চেষ্টা করবে, বাবা যদি সেদিক থেকে কিছু সাহায্য করতে পারে ভালো হয়।

বাবা ঝাঁজিয়ে উঠেছে।—কি সাহায্য—টাকা? আমার টাকার গাছ হয়েছে, না যেটুকু আছে শেষ বয়সে তা তোকে উড়নোর জন্য দেব?

মাও বিরক্ত। দাদা গম্ভীর। বউদির মুখে বাঁকা হাসি।

বাবা এরপর ভেবে-চিন্তে ওকে তার সেই শেয়ার-বাজারের বন্ধুর সঙ্গে জুড়ে দিল। এ লাইনে অনেক টাকার খেলা দীপু জানে, আর মাথা থাকলে ফকির লাখোপতি হয় এমনও শোনা আছে। নিজের মাথার ওপর আস্থার অভাব নেই। মাস ছয় লেগে রইল। কিন্তু এতটুকু আশার আলো চোখে পড়ল না। ছেড়ে দিল।

এরপর দিদির তাগিদে পড়ে বাসুদা সরকারী অফিসে ওর জন্য চাকরি ঠিক করল একটা। বাসুদা আবার কলকাতায় বদলি হয়ে বেশ বড় পোস্টেই বসেছে। ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে। অনেক ভেবে চিন্তে দীপু এই চাকরিটা নিল। প্রথম কারণ এখানে দাদার মুরুব্বিয়ানা থাকবে না। দ্বিতীয় কারণ, বাড়িতে খরচ যখন কিছু নেই, বছর দেড়েকের চেষ্টায় হাজার তিনেক টাকা জমাতে পারলেও দীপু ওর লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে—বরাবরই কল-কব্জা স্ক্রু নাট বোলটুর দিকে ঝোঁক—এই লাইনেই কিছু একটা করবে—আর এই দিনে তো এ-সব থেকেই টাকা!

প্ল্যান ঠিক হতেই মঞ্জুর কাছে ছুটল। ওকে না জানিয়ে কিছু ভাবেও না, করেও না। কিন্তু বড় হওয়ার রাস্তাটা চোখের সামনে দেখিয়ে দিলেও মঞ্জু আগের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। মুখের দিকে চেয়ে টিপটিপ হাসে। এই প্ল্যান শুনেও তাই করল। বলল, ঠিক আছে, বসে না থেকে লেগে পড়ো

কিন্তু এই চাকরিতেও মন বসে না। কি করে বসবে, যে দরিয়ায় নৌকো ভাসানো স্থির—এ ক্ষেত্রটাই তা নয়। তবু একটা বছর টেনে গেল। হিসেব মতো হাতে যা জমবে ভেবেছিল এক বছরে তার অর্ধেকও জমল না। কি করে যেন খরচ হয়েই যায়। টাকা জমাতে হবে বলে ছুটির দিনে মঞ্জুকে নিয়ে কোনো সিনেমা থিয়েটারে যাবে না, রেস্তোরাঁয় খাবে না তাই বা হয় কি করে? অবশ্য মঞ্জু বাধাই দেয়, যেতে চায় না। বলে, এভাবে টাকা খরচ করলে তোমার পুঁজি বাড়বে কি করে?

দীপুর এক কথা।—কি করে বাড়বে জানি না, সময় হলে পুঁজি আপনি হাতের মুঠোয় আসবে।

মুখে যা-ই বলুক, চাকরির এই এক বছরে ভিতরে ভিতরে নিজেই ক্লান্ত। সেই সঙ্গে হতাশার ছায়া। সে-সব দূর করতে এ-বই টানে ও-বই ওল্টায়। উদ্দীপনার রসদ খোঁজে। নিজেকে চাঙ্গা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা-ও যেন নিজের সঙ্গে এক ধরনের যোঝাযুঝি করার মতো হয়ে উঠেছে এখন। আরো খারাপ লাগে, ওই ক্লান্তি নিয়ে আপিসের পর যখন বাড়ি ফেরে, মঞ্জুর দেখা ইদানীং কমই মেলে। দীপুর রাগ হয়, ওর বি এ-তে অনার্স নেবার কি দরকার ছিল? ওর কি চাকরি করার দরকার হবে কখনো না দীপু তা করতে দেবে? তার ফলে দীপু যখন ঘরে ফেরে মঞ্জুর তখন পড়ার সময়। সাফ বলে দিয়েছে, এক রোববার ছাড়া আমাকে পাচ্ছ না।

কিন্তু রোববারেও যে পাবেই এমন কোনো স্থিরতা নেই। সকালে দুপুরে দেখা বা কথা হয়তো কিছু হল, কিন্তু বিকেল সন্ধ্যাটাই ওর সঙ্গে কাটানোর জন্য দীপু লালায়িত হয়ে থাকে। আর দীপুর সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যেই যেন ওর বোনেদের ছোট বোনের প্রতি ভালবাসা উথলে উঠছে আজ-কাল। আজ এই বোনের বাড়ি এই ব্যাপার, কাল সেই বোনের বাড়ি সেই ব্যাপার। দীপুর অভিমান হয়। মাঝে মাঝে সংশয়ের আঁচড় পড়ে, ওর ওপর মঞ্জুর আস্থা কমে

আসছে কিনা। এমন চিন্তা মাথায় আসাটাও যন্ত্রণার ব্যাপার। দীপু সেটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। না, এ-রকম কখনো হতে পারে না।

দীপুর এই গোছের মানসিক অশান্তির মধ্যেই হঠাৎ নতুন আশার আলো দেখল একদিন। এক রোববারের সকাল সেটা। যোগব্যায়াম আজও ছাড়েনি, তাই খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। ফলে চা-খাওয়া কাগজ পড়ার পরেও কম করে ঘণ্টা দুই আড়াই ছটফট করে কাটাতে হয়। কারণ বেলা সাড়ে আটটার আগে মঞ্জুর দেখা পাওয়ার আশা নেই। দীপু বিছানায় শুয়ে শুয়েই বইয়ের তাকগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছিল, দুই আড়াই ঘণ্টা কাটানোর মতো কোন্ বইটা টেনে নেওয়া যায়। এখন সামান্য থেকে বড় হওয়া মানুষদের নিয়ে বইয়ের সংখ্যা বাড়ছে।

ফণী এসে খবর দিয়ে গেল, নিচে কে ডাকছে।

দীপু মনে মনে আবাক। এই সকালে তাকে বাড়ি এসে ডাকার মতো কে আছে ভেবে পেল না। দোতলায় এসে দেখল বসার ঘরে কেউ নেই। একতলায় নেমে এলো! যে লোক সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে, তার দিকে চেয়ে দীপু থমকে রইল খানিক। তারপরেই আনন্দের শিহরণ।—রতন তুই!

দীপুর ছেলেবেলার সেই একাত্ম আর একান্তের দোসর রতন। ডাক্তার বাবা মারা যাবার পর যাদের ওই একতলার ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে হয়েছিল। তখন দীপুর অন্তরাত্মায় ঘা পড়েছিল, ঘরের লোকের সেই স্বার্থের মূর্তি দেখে ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। মঞ্জুরা আসার পরেও তিনতলার ঘরের নিরিবিলি অবকাশে রতনের শুকনো মুখ দীপুর যে কখনো মনে পড়েনি এমন নয়। কিন্তু তখন আর খেদ ছিল না। বরং মনে হয়েছিল, ওপরঅলা যা করে, কোনো কিছু ঘটাবার জন্যেই করে। রতনরা একতলার ওই ফ্ল্যাটে থাকলে মঞ্জুর সঙ্গে যোগাযোগই হত না।

রতনও খুশি মুখে বলল, যাক, চিনতে পেরেছিস তাহলে। এই নিয়ে গত দেড় বছরের মধ্যে চারদিন এলাম তোর কাছে—আজ তোকে ধরবই বলে সেই ভোর না হতে বেরিয়ে পড়েছি।

—তাই এখানে এসেছিস! দীপু সত্যি অবাক।—কই আমি তো জানি না।

—একদিন ছুটির দিনের দুপুরে এসেছিলাম, আর দুদিন বিকেলে। তোর টিকির দেখা নেই, কোথায় গেছিস বা কখন ফিরবি তা-ও কেউ বলতে পারেনি।···আসলে আমাকে কেউ চিনতেও পারেনি বোধহয় তাই বলেনি।

দীপু রতনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার। হঠাৎ দেখলে চিনতে না পারারই কথা। মাঝে সাড়ে সাত বছরের ফারাক। নাকের নিচে ছোটর ওপর পুষ্ট একটু গোঁপ রেখেছে, গোঁপের দু দিক কামানো। আগে ছোট করে চুল ছাঁটত, সে-জায়গায় এখন ঝাঁকড়া চুল। আগে বেশ রোগা ছিল, এখন দিব্বি হৃষ্টপুষ্ট! আর সেই হাফ-প্যান্ট হাফ শার্ট পরা ছেলের পরণে এখন ট্রাউজারস আর রঙচঙা বুশ শার্ট। দীপু পর্যন্ত এই জন্যেই খানিক থমকে চেয়েছিল।

রতনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে ওপরে টেনে নিয়ে চলল। ফণীকে হুকুম করল, দোকান থেকে গরম সিঙাড়া এনে চায়ের সঙ্গে দিয়ে যেতে। তারপর দুজনে মিলে সানন্দে সেই ছাদের ঘরে।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে রতন বলল, ঠিক সেই রকমই আছে—

দীপু হেসে জবাব দিল, সেইরকম নয়, বইগুলো বদলেছে। সেই সঙ্গে বই পড়ার মানুষটাও। বোস—

খাটের বিছানাতে দুজনে বসল। রতন জিগ্যেস করল, তার মানে আগের থেকে আরো বেশি পড়াশোনা নিয়ে আছিস?

—তার মানে আগের থেকে ঢের কম, তেমন বই চোখে পড়লে

অভ্যেসে কিনে ফেলি, পড়ার সেই মনটা আপাতত নেই। যাক, তুই কলকাতায় কবে এলি?

রতন একটু হিসেব করে জানান দিল, প্রায় সাড়ে চার বছর। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর থেকেই।

—বলিস কি রে! কলেজে পড়ার জন্য কলকাতায় চলে এসেছিলি?

—কলেজে! আমাদের আবার কলেজে পড়া···

—কেন, তোর সেই দাদা ডাক্তার হয়নি?

—আমার হায়ার সেকেণ্ডারির দেড় মাস আগে দাদা কলকাতায় বাস চাপা পড়ে মারা গেছল—কাগজে খবরটা বেরিয়েছিল তো··· ভেবেছিলাম তুইও দেখেছিস।

দীপু স্তব্ধ খানিক।

ফণী চা সিঙাড়া দিয়ে গেল। সানন্দে সেদিকে হাত বাড়িয়ে রতন বলল, আমি মিস্ত্রি মানুষ, আমার কথা ছাড়্, আগে তোর কথা শুনি। তোর চেহারাখানা কিন্তু এখন খাসা হয়েছে।

মিস্ত্রি শুনে দীপুর একটু কৌতূহল হল।—আমার আর কি কথা···টায়েটায়ে ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি উৎরেছিলাম, বি এস সিতে অনার্সও পেলাম না···আপাতত আপার ডিভিশন কেরানি।

—বলিস কি রে! রতনের যেন বিশ্বাস হয় না।—কালে দিনে তুই মস্ত একজন হবি আমি তো একেবারে ধ্রুব-সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম!

দীপু এবারে হাসল, বলল, সেটা মিথ্যে হবে এমন ধরারও কোনো কারণ নেই

রতন অবাক।—তাহলে বাজে কথা বলছিলি বল্—

—না সত্যি কথাই। আগে তোরটা শুনি—তুই মিস্ত্রি কি রকম?

রতন জানালো হাওড়ার একটা বড় ওয়ার্কশপে সে এখন সাব-

ফোরম্যান। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কলকাতায় এসে ওখানে অ্যাপ্রেনটিস হয়ে ঢুকেছিল—লেদের আর মোলডিং-এর কাজে স্পেশালাইজ করেছে। তার কাজ দেখে এই ক বছরের মধ্যেই কোম্পানির কর্তারা খুশি। দু দুবার প্রমোশন দিয়েছে। ফোরম্যান হতেও তিন-চার বছরের বেশি সময় লাগবে না। ভগবান অনেকটা মুখ তুলে তাকিয়েছে, মা অনেক দুঃখ পেয়েছে, ওর প্রতিজ্ঞা মায়ের দুঃখ ঘোচাবেই—মায়ের আশীর্বাদেই নিশ্চয় ম্যানেজার সাহেব খুব খুশি ওর ওপর। ম্যানেজার কোম্পানীর মালিকদেরই একজন।

দীপু একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। ওরও চোখমুখে বড় হওয়ার বাসনা দেখতে পেল। জিগ্যেস করল, এতে আর কত বড় হতে পারবি ?

—কেন, ঠাকুর সহায় থাকলে কোনদিন নিজের ছোটখাট একটা লেদ আর মোলডিং ফ্যাক্টরি হতে পারে।

দীপু লাফিয়ে উঠল।—পারে ? পারে যদি তাহলে ছোট-খাটর কথা ভাবছিস কেন ?

—ভাবলে তো ছোট থেকেই ভাবতে হবে, তাও আকাশকুসুম।

দীপুর মধ্যে একটা উত্তেজনা শুরু হয়েছে। তোদের ওটা বেশ বড় ওয়ার্কশপ বলছিস ?

—মস্ত। ওদের নিজেদের অয়্যার হাউসও আছে—আমি তো সামান্য কাজে লেগে আছি—ফ্যাক্টরিতে অনেক রকমের কাজ হয়।

দীপু উন্মুখ একেবারে।—রতন আমাকে ঢোকাতে পারবি ? আপাতত আমি এক পয়সাও চাই না, প্রাণ ঢেলে শুধু কাজ শিখব——পরে স্বাধীন ব্যবসায় অনেক বড় হওয়া যায় এমন কাজ। শুধু আমি নয়—আমি আর তুই একসঙ্গে ব্যবসা করব, একসঙ্গে বড় হব—সে কত বড় তুই আজ ভাবতেও পারবি না—কিন্তু হবই! পারবি আমাকে ঢুকিয়ে নিতে ? এই উদ্দীপনা দেখে রতন হাঁ।—কি বলছিস রে···সরকারী চাকরি ছেড়ে দিবি ?

এই চাকরি বিষ আমার কাছে। তুই না পারিস এ চাকরি আমাকে ছাড়তেই হবে। এরপর আস্তে আস্তে নিজের মনের কথা বলে গেল দীপু। কি করতে চায়, কি হতে চায়। সেই পথ খোলা না পেয়ে কি যন্ত্রণা ওর বুকের তলায়। কোনো ছোট কিছুর সঙ্গে আপোস নেই—বড় তাকে হতেই হবে—হবেও। রতন পাশে থাকে ভালো, নইলে সে একলাই এগোবে।

রতন আগেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো বন্ধুর কথা শুনত। আজও শুনল। এই তপ্ত আকাঙ্ক্ষার আঁচ ওরও মনে লাগল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল, দুজনে পাশাপাশি থেকে অনেক বড় হবে।

একটু ভেবে বলল, ঠিক আছে, কালই আমি আমাদের ম্যানেজারকে ধরে পড়ছি……তার দাদা ফ্যাক্টরি সুপারিনটেনডেন্ট, আর বড় মালিকদের একজন।…সে যদি তাকে বলে দেয়, অ্যাপ্রেনটিস হয়ে ঢোকার ব্যাপার অসুবিধা হবে না। তাছাড়া তুই বি এসসি পাশ আছিস—আর চেহারাখানাও দারুণ স্মার্ট হয়েছে তোর—ভগবানের ইচ্ছে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।…ফ্যাক্টরির কথা বললাম এই জন্যে, যত বড় তুই হতে চাস তাতে লেদ বা মোলডিং-এ সুবিধে হবে না—ম্যানুফ্যাকচারিং-এর দিকে যেতে হবে…পাইপ লাইন বা কেবলস-এর একটা বেছে নিতে হবে…ও-সবের দারুণ ডিমাণ্ড এখন।

আনন্দে উদ্দীপনায় উত্তেজনায় দীপুর স্নায়ুগুলো কাঁপছে।—তাহলে তুই আর আমি একসঙ্গে ব্যবসা করব কি করে?

রতন হাসল।—যা-ই করিস, আমার দিকটা বাদ দিয়ে হবে না, বরং দুজনের দু দিকে স্পেশালাইজ করাই ভালো।

দীপু রতনকে বিকেলের আগে আর ছাড়লই না। সমস্ত দুপুর দুজনের জল্পনা কল্পনার মধ্যে কাটল। রতনের এক সমস্যা, এ সব ব্যবসার জন্য প্রচুর ক্যাপিটাল চাই। বই টেনে নিয়ে দীপু আট-দশখানা নজির দেখালো, জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা যাকে বলে বার্নিং ডিজায়ার

পুষে তারা কত অসাধ্য সাধন করেছে। আসল ক্যাপিটাল ওই বার্নিং ডিজায়ার!

সকালে একবার আর দুপুরে একবার রতনকে ঘরে বসিয়ে দীপু একতলায় নেমে এসেছিল। সকালে দেখে বাইরের ঘরে মঞ্জু দুই দিদি আর দুই ভগ্নিপতির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। দীপু চুপচাপ চলে এসেছে। দুপুরে এসে ওর মায়ের কাছে শুনেছে ছোট মেয়ে কোন্ বন্ধুর বাড়ি গেছে। অগত্যা মনে মনে বিকেলের প্রতীক্ষা। রতনকে মঞ্জুর কথা বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলল না। দীপুর বিবেচনায় মনের জোর তার নিজের মতো কম লোকেরই। তাই লক্ষ্যে অনড় থাকার জন্য ওর মাথায় আর প্রেমের ব্যাপারটা ঢোকালো না। সময়ে সবই জানবে।

বিকেলের মধ্যে রতনের মনেও আশা আর উদ্দীপনা আরো জমাট বেঁধেছে। ঠিক হয়েছে দীপু পরদিন আর অফিসে যাবে না। খুব ভোরে রতনের হাওড়ার মেসে যাবে। সম্ভব হলে রতন কালই ওর মুরুব্বির মারফৎ ফ্যাক্টরি সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে একটা ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা করবে।

রতনকে বাসে তুলে দিয়ে দীপু সোজা মঞ্জুর খোঁজে এলো। বাড়ি নেই শুনে ভিতরটা অসহিষ্ণু। মঞ্জুর মা জানালো মেয়ে বিকেলের শো-তে সিনেমা দেখতে গেছে। দীপু রাগে গজগজ করতে করতে ফিরল।

ভাগ্যের মুখ দীপু সূচনাতেই—দেখল বটে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে রতনের ম্যানেজারের পছন্দ হল। রতন অবশ্য তাকে আগে থাকতেই ভিজিয়ে এসে ওকে নিয়ে গেছল। ম্যানেজার স্লিপ লিখে দীপুকে ফ্যাক্টরি সুপারিনটেনডেণ্ট চ্যাটার্জি-সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিল। এই ভদ্রলোক বাইরে রাসভারী, কিন্তু ভিতরে রসিক।

কথাবার্তা বেশিরভাগ ইংরেজিতেই বলল, আর ওর ইংরেজীতে জবাব দেওয়াটাও লক্ষ্য করল। বি এসসি পাশ গভর্ণমেন্টের চাকরি ছেড়ে ফ্যাক্টরির অ্যাপ্রেনটিস হতে চাওয়াটা কমই দেখেছে। ওর আকাঙ্ক্ষার কথা শুনল, উদ্দীপনা দেখল। যে-বন্ধু অর্থাৎ রতন ব্যানার্জী ওকে এনেছে তার সুনামও জানা আছে। খাঁটি বড় ব্যবসায়ী মাত্রেই কাজের লোক খোঁজে আর কাজের লোক চেনেও। শেষ কালে বললেন, বিনে পয়সায় অ্যাপ্রেনটিস থাকতে হবে না—যে টাকা মাইনে পাচ্ছ সে-টাকায় প্রোবেশনার হিসেবে থাকো, সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ শেখো,—সত্যিকারের যোগ্যতা দেখাতে পারলে উন্নতি হবে—না পারলে বড় হবার অন্য রাস্তা খুঁজতে হবে।

রতনের আশা অনুযায়ী দীপু কেবলস ডিভিশনেই প্রোবেশনার হিসেবে জায়গা পেল।

তার কাছ থেকে বেরিয়ে এসে দুই বন্ধুতে আনন্দে জড়াজড়ি। রতন এখন বিশ্বাস করছে, বড় হবার সিঁড়ি তারা পেয়েই গেছে। স্মার্ট বন্ধুর বার্নিং ডিজায়ারের ফল হাতে নাতে দেখছে।

সকাল ন'টা থেকে ফ্যাক্টরি শুরু। রতনকে বাড়ি থেকে বেরুতে হবে সকাল আটটায়। বিকেল পর্যন্ত চাকরি—মাঝে একঘণ্টা লাঞ্চ ব্রেক। রতন আগে থাকতে জানিয়ে দিল, এর ওপর কর্তারা চাইলেই ওভারটাইম করতে হবে—অবশ্য তার জন্য আলাদা টাকা পাওয়া যাবে। দীপুর কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। জয়েন করার জন্য দু দিনের মাত্র সময় নিয়ে এসেছে।

রাত সাড়ে আটটায় মঞ্জুর দেখা পেল। তার আগে বাড়ি ছিল না। দীপু চারবার করে খবর নিয়েছে। শেষের বারে পেল। বাইরের ঘরে এসে মঞ্জু জানান দিল, খুব মাথা ধরেছে।

দীপুর কানেও ঢুকল না। নতুন উদ্দীপনায় ভরপুর। বলল, বোসো, ভালো খবর আছে—

কি খবর বলে গেল। ভবিষ্যতের বড় হবার ছবিটা মঞ্জুর চোখের

সামনে ছকে দিতে লাগল। সেই ছবিতে এতটুকু গোঁজামিল নেই। দীপু যেন ধাপে ধাপে সব দেখছে আর বলছে।

মঞ্জু শুনছে। চেয়ে আছে। তার ঠোঁটে আর চোখের কোণে টিপটিপ হাসি। দীপুর বলা শেষ হবার পরেও মঞ্জুর হাসিছোঁয়া দু চোখ ওর মুখের ওপর স্থির খানিক। পরে বলল, দীপু, আমি সত্যি বিশ্বাস করি একদিন তুমি অনেক বড় হবে—তোমার চোখ-মুখই তা বলে দিচ্ছে···

দীপু খুশিতে আটখানা। জবাব দিল, আমি কতবার তো বলেছি, তোমার মতো একজন পাশে থাকলে অনেক বড় তো হবোই—কেউ রুখতে পারবে না।

মঞ্জু এবারে হেসে উঠল। বলল, কিন্তু সে কবে গো কবে—দুজনারই চুলে পাক ধরলে ?

দীপু এ-কথা কানে তুলল না। জোর দিয়ে জবাব দিল, একবার সিঁড়ি যখন পেয়ে গেছি, ডগায় পৌঁছুতে কত আর সময় লাগতে পারে—কি বা বয়েস আমার এখন, তেইশও হয় নি সাড়ে বাইশ চলছে—খুব বেশি হলে সাতাশ গড়াবে—আর তোমার চব্বিশ—সেটা এমন কিছু চুল পাকার বয়েস নয়।

মঞ্জু এ কথার জবাব দিল না। তার চোখের কোণে আর ঠোঁটে তেমনি টিপটিপ হাসি।

দীপু এর পর সত্যি তার কর্মযোগে নিবিষ্ট হল। সকাল আটটায় বেরোয়, রাত আটটায় ফেরে। দুপুরের খাওয়া ফ্যাক্টরির ক্যান্টিনে। সিদ্ধির পথ পেয়েছে, খাটুনির আর পরোয়া করে না। ছুটির পরেও কেবলস সংক্রান্ত খুঁটিনাটি যাবতীয় ব্যাপার জানতে চেষ্টা করে, বুঝতে চেষ্টা করে। আর ওভারটাইম থাকলে আরো বেশি রাত হয়। তিন মাস যেতে রতন ওকে সানন্দে জানালো, আমার বস্ বললে তোর বস্ তোর ওপর দারুণ খুশি—বলেছে সত্যি একটা ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, এই মন নিয়ে কাজ করলে অনেক উঠবে। তারপর,

বলেছে, তোর অনেক ওঠার ব্যাপারে একটা সুবিধে কি জানিস—তুই সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট···আমার যদি ডিগ্রিটা থাকত।

প্রায় ধমকের সুরে দীপু বলেছে, অনেক উঠব মানে আমি কি চাকরিতে ঘষ্টাবো নাকি—তোরও ডিগ্রি নেই বলে কিছু আটকাবে না।

আরো তিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ এক বছর প্রোবেশনারির জায়গায় সুপারিনটেনডেন্ট চ্যাটার্জী-সাহেব দীপুকে ছ মাসের পরেই পাকা করে নিল। ভাগ্য সদয় থাকলে অনেক রকমের অনুকূল ঘটনা ঘটে। কি একটা ব্যাপারে কোম্পানির ড্রাইভাররা একদিন আচমকা স্ট্রাইক করে বসল। চ্যাটার্জীসাহেবের নিজস্ব গাড়ি আর ড্রাইভার নিয়ে সেদিনই তার স্ত্রী বর্ধমানে কিসের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেছে। আর সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব নিজে যাবে দিল্লি, এয়ারপোর্ট থেকে আর এক ঘণ্টার মধ্যে তার এরোপ্লেন উড়বে। গাড়ি অনেক আছে, লোকজন একটা ড্রাইভারের জন্য ছোটাছুটি করছে। অবশ্য না পাওয়ার কথা নয়, এমন সংস্থা আছে যেখানে ফোন করলে ড্রাইভার পেতে সময় লাগে না। কিন্তু সমস্যা সময়ের।

দীপু সোজা চ্যাটার্জী-সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকল—যা সচরাচর নিয়মের বাইরে। এ-রকম বিভ্রাটে পড়ে ভদ্রলোকের সমস্ত মুখ কঠিন। দীপু সবিনয়ে বলল, চলুন সার, আমি আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিচ্ছি, কোন্ গাড়ি যাবে বলে দিন।

চ্যাটার্জী-সাহেব অবাক।—তুমি চালাবে। তোমার লাইসেন্স আছে?

—আছে।

—অভ্যেস আছে

—খুব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে আসুন সার।

—কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে তো লাইসেন্স নেই?

—আমার ওউনারশিপ লাইসেন্স, সঙ্গে রাখার দরকার হয় না।

অর্থাৎ গাড়ির মালিকের লাইসেন্স, তাই দরকার হয় ন

ভদ্রলোক চুপচাপ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর উঠল।

দীপু তাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল। ভদ্রলোক পথে একটা কথাও বলল না। ওকে লক্ষ্য করল। ওর গাড়ি চালানো লক্ষ্য করল।

দিল্লি থেকে ফিরে এসে চ্যাটার্জীসাহেব কঠিন হাতে ওই একদিনের ড্রাইভার স্ট্রাইকের মোকাবিলা করল। তার এক সপ্তাহ বাদে প্রদীপ বোসকে ডেকে একশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে তার পাকা হওয়ার খবর দিল। গাড়ি আছে এমন বড় লোকের ছেলে শুধু বড় হওয়ার উদ্দীপনায় তার কাছে ছুটে এসেছে—ভদ্রলোক যা করল তা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

রতন আর দীপুর কাছে তাদের লক্ষ্য এর ফলে আরো যেন নাগালের মধ্যে এসে গেল। দুই বন্ধুর স্বপ্ন রচনা দ্রুত এগিয়ে চলল। রতন এর মধ্যে বন্ধুর প্রেম-পর্ব আদ্যোপান্ত জেনেছে। বড় হওয়ার এমন আপোসশূন্য সঙ্কল্প কেন—তাও।

কিন্তু দীপুর কেবল দুঃখ, ছুটির দিনেও দু দণ্ড এখন মঞ্জুর সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পায় না। অনার্স ছাড়েনি বলে : ওই ছ মাস আগে থেকেই মঞ্জুর পড়ার চাপ বেড়েছে। অনেক দিন শুধু চোখের দেখা দেখে চলে আসতে হয়েছে। কোনদিন বা দু-চার মিনিটের কথা। আর এদিকে এমন ভাগ্যের উদয় অর্থাৎ প্রমোশনের ব্যাপার যখন— মঞ্জুর তখন পরীক্ষা শুরুই হয়ে গেছে।

সেই পরীক্ষা শেষ হবার প্রতীক্ষায় ছিল দীপু। শেষ হল। সেই সন্ধ্যায় দীপু সাড়ে সাতটায় মধ্যে বাড়ি ফিরল। তারপরেই তাজ্জব। নিচের ফ্ল্যাটের ঘর দোর সব বন্ধ। ওদের চাকরটার মুখে শুনল, সাহেব মেমসাহেব আর মিসি সাহেব সন্ধের গাড়িতে দুর্গাপুরে চলে গেছে। দু-তিন দিন পরে ফিরবে।

…চার দিন পরে ফিরেছে। সকাল আটটায় বেরুবার আগে দীপু দেখা করতে চেষ্টা করেছে। মঞ্জুর মা বলেছে, ওকে এখন পাবে কি, পরীক্ষার যে খাটুনি গেছে—ওর এখন ভালো করে সকাল হয়নি বলতে পারো।

আবার এমনই ফ্যাসাদ দীপুর। পর পর ক'দিন ওভারটাইম চলেছে—দরকারী কাজ সেরে দিতে হবে, কাটান দেবার উপায় নেই। বাড়ি ফিরতে রাত সাড়ে দশটা। তখন নাকি মঞ্জুর নিশুতি রাত। দীপুর রাগ হচ্ছে, অভিমান হচ্ছে, আবার কি-রকম একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিও তলায় তলায়।…কাল বাদে পরশু রবিবার। সেই প্রতীক্ষা।

কিন্তু শনিবার বিকেলেই বউদি হেসে হেসে বাজ পড়ার মতো খবরটা দিল।—তোর এতদিনের প্রেমিকার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল রে দীপু, ছেলে বিলেত ফেরত মস্ত এনজিনিয়ার, ছেলের বাপও দুর্গাপুরের মস্ত এনজিনিয়ার। ছেলে বাপের কাছে দিনকতকের জন্য দুর্গাপুরে এসেছিল—মিত্তিরসাহেবের সঙ্গে ছেলের বাপের আগেই কথাবার্তা হয়েছিল, ছেলে আসতে এরা মেয়ে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিল—ব্যস, বিয়ে পাকা।

দীপুর শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল থেমে গেল।—তুমি এত কথা জানলে কি করে?

—জানলাম। আমাদের যমুনা তো ওদের ওখানেও ঠিকে কাজ করে—ওর আবার কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতে বাকি থাকে!

দীপু বিশ্বাস করছে না। ইচ্ছে করছে, বউদিকে একটা ধাক্কা মেরে দশ হাত দূরে ছিটকে ফেলে দেয়। বিশ্বাস করছে না, কিন্তু মাথায় খুন চাপছে। সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে অপেক্ষা করল। তারপর নিচে নেমে এলো।

…ঘরে মঞ্জুকে একলা পেল। ওকে দেখে মঞ্জুর সেই একই মুখ। চোখে হাসি। ঠোঁটে হাসি। উল্টে ওকেই জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার? চোখ মুখের এই অবস্থা কেন?

দীপু চেয়ে আছে। না, বউদির কথা বিশ্বাস করার মতো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। জবাব না দিয়ে তবু জিগেস করল, যা শুনছি··· সত্যি?

মঞ্জু বেশ অবাক যেন।--কি শুনলে আবার?

—কোন্ এক মস্ত এনজিনিয়ারের সঙ্গে তোমার বিয়ে?

—ও মা। তোমার কানে গেল কি করে?

এটুকু শুনেই দীপুর পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। জোর দিয়ে বলল, এ সত্যি হতে পারে না··· সত্যি নয় তো?

ঠোঁটে আর চোখের কোণে সেই হাসিই মঞ্জুর। জবাব দিল, একেবারে সত্যি নয় বলি কি করে, দু-তরফেরই পছন্দ হয়ে গেল, আর আট দিনের মধ্যে বিয়ের তারিখও ঠিক। আবার হাসি।—তড়িঘড়ি বিয়ে করে ওই লোক আমাকে নিয়ে আবার তার কাজের জায়গায় ছুটবে—কি জুলুম বলো তো?

দীপুর মাথায় রক্ত উঠছে। ভাবতে চাইছে এটা ঠাট্টা। নিছক তামাসা। কিন্তু ভিতরে কেউ বলছে ঠাট্টাও নয় তামাসাও নয়। দুই একপা এগিয়ে এলো।—মঞ্জু এ হয় না, এ হতে পারে না, ছেলেবেলা থেকেই তুমি জানো তুমি আমার—আমার ছাড়া আর কোনোদিন কারো হতে পারো না!

মঞ্জু বেশ আলতো করে জবাব দিল, এমন কথা আমি কখনো দিয়েছি বলে তো মনে হয় না··যতদূর মনে পড়ে আমার কিছু শর্ত ছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শর্ত ছিল—সেই শর্তের দিকে আমি প্রাণপণ এগোচ্ছি—!

মঞ্জুর গলার স্বর এবারে একটু ঠাণ্ডা।—তুমি এগোচ্ছ, আর একজন সেখানে পৌঁছে বসে আছে···কোন্‌টা বেশি শিগগির ভাবো না নিয়ে

দীপু পাগলের মতো হাতের নাগালের মধ্যে এসে।মরা বড় হলে শর্তে আমিও পৌঁছুব—পৌঁছুব—পৌঁছুব। এ–

না—আমি তোমাকে অনেক দিন বলেছি, তোমার মতো একজনকে পাশে পেলে আমি বড় হব—কেউ আমাকে রুখতে পারবে না—কেউ না !

মঞ্জু জবাব দিল না। চেয়ে আছে, হাসছে টিপটিপ। পাগলের মতো এক হ্যাঁচকা টানে দীপু তাকে সোফা থেকে তুলে ফেলল, বাধা দেবার আগেই তুই সবল হাতে নিজের বুকের সঙ্গে ওঁকে পিষে ফেলতে চাইল। আবার বলে উঠল, মঞ্জু, এ হবে না—এ হতে পারে না—তুমি আমার- -আমার—

বলতে বলতে ওই লালচে তুই ঠোঁটও গ্রাসের আওতায় নিয়ে এলো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার তাড়না। থেকে থেকে মুখে কেবল এক কথা, মঞ্জু, এ হতে পারে না—বলো তুমি আমার—বলো আমার !

এমন আচমকা আক্রমণ থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে মঞ্জুর সময় লাগল একটু। শেষে জোর করে নিজেকে ছাড়ালো, ওকে ঠেলে সরালো।··বাবা মা একজনও বাড়ি নেই, বিয়ের তোড়জোড়েই বেরিয়েছে। চকিতে ভেবে নিল, ঘুরিয়ে কিছু না বলতে পারলে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়বে মনে হল। জোর করেই মুখে হাসি টেনে আনল, বলল, ঘরের দরজা তুটো খোলা সেদিকেও চোখ নেই ?··· তুমি ওপরে যাও, আমি বাবার সঙ্গে কথা বলে নিই।

দীপু তবু দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গ কাঁপছে। তার তু চোখে ভয় অবিশ্বাস আবার একটু আশাও।

এবারে মঞ্জুর গলাও কঠিন একটু।—আর তু মিনিট দাঁড়ালে আমাকে তুমি বিগড়ে দেবে বলে দিলাম।

দীপু বেরিয়ে এলো। সোজা তিনতলায়। ঘর থেকে কুজোটা এনে মাথার ওপর গবগব করে জল ঢালল।

চোখে হাসি। [illegible] বাদে দোতলার বারান্দায় ক্রুদ্ধ গলা শোনা গেল। ব্যাপার ? চোখ মু[illegible]ড়ি নেমে বাঁকের আড়ালে। একতলার মিস্ত্রির

সাহেবের গলা। বেশ চিৎকার করেই বলছে, আপনার ওই ছেলে এক নম্বরের রাসকেল! আমার ঘরে ঢুকে আমার মেয়েকে অপমান করে এসেছে, তার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলে এসেছে—আমি বাড়ি থাকলে তাকে আমি উচিত শিক্ষা দিতাম—তাকে সাবধান করে দেবেন—আই অ্যাম এ ভেরি ভেরি টাফ ম্যান!

সে নিচে নেমে যেতেই বাবা হাঁক দিল, দীপু—এই রাসকেল!

দীপু নেমে এলো।

রাগে অপমানে বাবা কাঁপছে।—কি বলেছিস? কি করেছিস তুই—তারা এ-রকম কথা বলে গেল কেন? চুপ করে আছিস যে? জুতিয়ে আমি তোর মুখ খোলাবো?

ওদিকে দাদারও রাগে কঠিন মুখ। বলল, করিস মিস্তিরিগিরি—ওই মেয়ের দিকে হাত বাড়াতে গেছলি লজ্জা করে না? কুঁজোর চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে—কেমন?

মা চেঁচিয়ে উঠল, মুখে বলে কি হবে—ওকে ধরে দে না ঘা-কতক!

মঞ্জুলা মিত্তিরের বিয়ে হয়ে গেল।

···না দীপু বাড়ি ছেড়ে বা ঘর ছেড়ে চলে যায় নি। এই আট দিনই সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি সে তার ঘরে। ফ্যাক্টরিতেও যায়নি। ব্যস্ত হয়ে রতন খোঁজ নিতে এসেছিল। এসে সব জেনেছে, সব বুঝেছে। পরে হাতে ধরে তাকে ফ্যাক্টরিতে আসার জন্য অনুনয় করেছে। বলেছে, সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব আজ কদিন ধরে ওর খোঁজ করছে—ওকে ডেকে খোঁজ নিতে বলেছে, হঠাৎ কঠিন কিছু অসুখ করল কিনা। তারপর টানাটানি, ওকে ফ্যাক্টরিতে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বেই না। আর সান্ত্বনার কথাও বলেছে, আমরা বড় হলে অমন ঢের-ঢের মেয়ে আসবে তোর কাছে।

দীপুর এক জবাব।—বিরক্ত করিস না, এখন কিছুদিন একলা থাকতে দে আমাকে—মন স্থির হলে কি করব না করব তোকে অন্তত জানাবো।

রতন আঁতকে উঠল।—তার মানে তুই ফ্যাক্টরি ছেড়ে দিবি?

—তা-ও জানি না। ফিরে যদি যাই, দেখতেই তো পাবি।

রতন না-ছোড়।—আমি বলছি তোকে ফিরে আসতেই হবে—তোকে বড় হতেই হবে!

—কপালে লেখা থাকলে ফিরব—হব।

পরের সপ্তাহেই রতন এসে আবার জানালো, তার ম্যানেজারের জেরায় পড়ে দীপুর সব কথা তাকে বলতে হয়েছে—বলতে গিয়ে ও অদ্যোপান্ত বলেছে,—যার জন্য বড় হওয়ার এমন ঝোঁক—সেই মেয়ের বিশ্বাসঘাতকতার কথা পর্যন্ত—

দীপু একটু শুনেই রেগে গেল, বিশ্বাঘাতকতার কথা বলতে গেলি কেন—আমিই দুনিয়ার সেরা গর্দভ এ-কথা বলতে পারলি না?

তারপর রতনের বক্তব্য, পরদিনই ওদের ম্যানেজারের দাদা অর্থাৎ দীপুদের সুপারিনটেনডেন্ট চ্যাটার্জী সাহেব রতনকে ডেকে পাঠিয়েছিল! বলেছে, তোমার বন্ধুর শক্ আমি বুঝতে পারছি—এটা তাকে একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে নিতে বলো—আর জানিয়ে দিও, মন স্থির হলে যখন ইচ্ছে সে এসে আবার কাজে লাগতে পারে—এই কোম্পানির দরজা তার জন্য খোলা থাকল।

শোনার পরেও দীপু নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত!

একটা একটা করে দিন যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বলতে গেলে বাইশ ঘণ্টা দীপু এই তিনতলার ঘরে থাকে। ফণী দু বেলাই তার খাবারটা ওপরে দিয়ে যায়। দীপু সারাক্ষণ বইগুলো নাড়াচাড়া করে। পড়তে ঠিক পারে না।...সেদিন পড়ছিল, পৃথিবীর সর্বকালের সেরা শিল্পীদের একজন যার নাম ভিনসেণ্ট ভ্যানগগ, সে পাগলামী করে নিজের কান কেটে প্রেমিকাকে উপহার পাঠিয়েছিল। তারপর পড়া

আর এগোয়নি। বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। নিজের কান না কাটুক, নিজের সমস্ত ভবিষ্যতের বুকে ছুরি বসিয়ে সে তিনতলার একটা ঘরে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে—এ শুনলেই বা লোকে পাগল ছাড়া আর কি বলবে ?

…দীপু এখন দিনের পর দিন প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করছে, ওর জগৎটা হারিয়ে যায়নি। মাঝের যে কতগুলো বছর ধরে তার জগৎটা খুইয়ে বসেছিল আসলে সেটাই আবার ওর কাছে ফিরে এসেছে।

কিন্তু কাজ নেই কর্ম নেই রোজগার পাতির চেষ্টা নেই—মাসের পর মাস তার এভাবে বসে থাকাটা বাড়ির মানুষ বরদাস্ত করবে কেন? ওপরে বাথরুম নেই, চানের ব্যবস্থা নেই। দিন-রাতের মধ্যে বার কয়েক তো দোতলায় নামতেই হয়। বউদি বাতাসে কথা ছোঁড়ে, মা রাগে গজগজ করে, বাবা তো সময় সময় রেগে আগুন। তার রাগের আরো কারণ, শেয়ার মার্কেটের পুঁজিটুকুও খুইয়ে বসেছে—আসলসুদ্ধ মার খেয়েছে। কিন্তু বাবার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যেন দাদার সৌভাগ্যের বরাত বাঁধা। দাদা এখন তার কোম্পানীর পাঁচ-সাতটি মাথার মধ্যে একজন! বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়ির এত কালের পুরনো গাড়ি বেচে নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে। বাবার পুরনো গাড়ির দামও সবটাই দাদা বাবার হাতে তুলে দিয়েছে। দাদা বাবা-মায়ের চোখে বরাবরই রত্ন। এই দুর্দিনে তো একেবারে রত্ন অমূল্য।

দাদার চলা ফেরা অফিস যাতায়াত সবই এখনো অফিসের গাড়িতে। তার গাড়ি বলতে গেলে বউদির হেপাজতে। একে একে এ-গাড়ির জন্য তিন চারটে পার্ট টাইমে ড্রাইভার রাখা হয়েছে। কিন্তু কেউ টেকে না। কেউ ফুলটাইম কাজ পেয়ে চলে যায়, কেউ বউদির মেজাজ দেখে, কেউ বা দাদা বউদির দুজনেরই মেজাজ দেখে। ফলে গাড়ি চালানোর জন্য অনেক সময় দীপুর ডাক পড়ে। মা কালীঘাট যাবে, বাবা পুরনো পাওনা আদায়ে বেরুবে, দাদার ছেলের কোন্ দিন স্কুল বাস ধরা হয়নি, বউদির প্রায়ই জরুরি দরকারে বেরুনো—

সর্বব্যাপারে মা এসে দীপুকে ডাকবে। বলবে, বাড়ির কোনো কাজে না লাগলে চলবে কেন!

দীপু মুখ বুজেই নেমে আসে। গাড়ি চালায়। কিন্তু ছ মাসের মধ্যে দীপু এই এক ব্যাপারেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বিশেষ করে বউদির আচরণে। দুবেলা কাজ না করে খেতে পায় বলে ও যেন তার কেনা ড্রাইভার। আর এ-ও জানা কথা, ও আছে বলেই এই নতুন গাড়ির ড্রাইভার নেই বা আসছে না। দীপু নিয়ে যায়, বউদি তার মতো শপিং করে—দীপু ড্রাইভারের মতোই স্টিয়ারিং-এ বসে থাকে। বউদি বাপের বাড়ি যায়, ইচ্ছে মতো ঘণ্টা দু ঘণ্টা আড্ডা দেয়—দীপু ড্রাইভারের মতোই স্টিয়ারিং-এ বসে থাকে।

ঠিক ছ মাসের মাথায় অসহ্য হল একদিন। বউদির বাপের বাড়ির কার বিয়ে। বউদি ভারী ব্যস্ত। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে আসছে। সেদিন দীপুর ওপর হুকুম হল, তার বাপের বাড়ির কাকে তুলে নিয়ে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে। ওকে নিচে ডেকে বউদি নিজেই ফরমাইস করেছিল। সব-সময় মা-কে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

দীপু মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল, পারব না।

সঙ্গে সঙ্গে বউদি তেতে উঠল, আমি কথা দিয়ে এসেছি—তারা অপেক্ষা করছে।

দীপু বলল, তোমার কথা দেওয়া উচিত নয় সেটা জেনে রাখা ভালো। আমার দ্বারা হবে না।

ওপরে চলে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মা মারমুখি হয়ে ওপরে উঠে এলো। আর সেই একই কথা শুনে জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল। এরপর বাবা ওকে মারতেই এলো প্রায়। দীপু তিনতলা থেকে নামল না।

সন্ধ্যায় দাদা ফিরতে ফয়েসলা হয়ে গেল। দাদার গলা-ফাটানো চিৎকার কানে আসছিল।—এতবড় অপমানের পর তার এই ভাইয়ের

সঙ্গে থাকা আর পোষাবে না—অনেক সহ্য করেছে আর নয়—বাবা এর বিহিত করতে পারে করুক—নয়তো সে-ই নিজের পথ দেখছে।

দীপু প্রস্তুত ছিল। বাবার হাঁক শোনামাত্র নেমে এলো। বাবা রাগে কাঁপতে কাঁপতে গর্জন করে উঠল।—এই মুহূর্তে তুই বাড়ির বার হয়ে যাবি—নইলে জুতিয়ে বার করব।

দীপু দ্বিতীয় গর্জন শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল না। তিনতলায় উঠে গেল। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিল। পনের মিনিটের মধ্যে জামা-কাপড় ব্যাঙ্কের পাশবই স্যুটকেসে গুছিয়ে নিল। স্যুটকেস হাতে বাইরে এসে ঘরটার দিকে তাকালো একবার। না, এটাও যে ওর নিজের জগৎ নয় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। দীপুকে তার নিজের জগৎ উদ্ধারেই যেতে হবে। সেটা কেমন হতে পারে কোনো ধারণা নেই।

বাবা দাদা বউদি মা তখনো দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওকে স্যুটকেস হাতে নামতে দেখে সকলেই থমকালো একটু।

কারো দিকে না চেয়ে দীপু সোজা একবার মায়ের দিকে তাকালো। মায়ের মুখ রাগে গণগণ করছে। মা যেন বলতে চাইছে, যা—! গিয়ে ভ্যাখ কত ধানে কত চাল!

দীপু নেমে এলো। রাস্তায়।

কিন্তু কোথায় যাবে?

আপাতত রতনের ওখানে। রতনের মেসে। মালিক সুপারিনটেনডেন্ট চ্যাটার্জী সাহেব নাকি রতনকে বলেছিল, তার কোম্পানীর দরজা ওর জন্যে বরাবর খোলা থাকবে। এখনো খোলা থাকুক দীপু সেটা চায় কিনা জানে না। তবু রতনের ওখানেই আগে গিয়ে দেখা যাক। দীপু ওকে কথা দিয়েছিল, কি করবে না করবে ওকে জানাবে। কি করবে জানে না। আপাতত বাড়ি ছাড়ল এটুকুই জানানোর মতো।

॥ ছয় ॥

কাহিনীর এখানে যবনিকা টানলে দীপুর জগৎ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

না, প্রায় ষোল বছর পরের এই জগতে দীপু নামে কারোর অস্তিত্ব নেই, এই নামে তাকে ডাকারও কেউ নেই। এই জগতে সে প্রদীপ বোস—প্রদীপ।

···বয়েস এখন আটতিরিশ। কিন্তু চেহারায় বয়েসের ছাপ পড়ে নি। অনেক জানা অনেক দেখা আর অনেক বোঝার যে অভিজ্ঞতা তার একটু মিষ্টি ছাপ চোখে মুখে ঠোঁটে ছড়িয়ে আছে। চোখে হালকা সোনালি ফ্রেমের চশমা, সামনেটা রোলগোল্ডের। দেখতে সৌখিন। পাওয়ার অবশ্য সামান্যই। মাথার ঝাঁকড়া চুলের দুই একটায় পাক ধরেছে। সুশ্রী সুন্দর পুরুষের ওই দুচারটে সাদা চুল যেন একটু বাড়তি আকর্ষণ। এক-নজর তাকালেই মনে হবে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ তার গণ্ডীর মধ্যে নিশ্চিন্ত দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন পড়ন্ত বিকেল। রাঁচির বি এন আর হোটেলের গালচে বিছানো সিঁড়ি ধরে প্রদীপ বোস টকটক করে নেমে আসছে। রাঁচিতে এটাই সব থেকে অভিজাত হোটেল। তার পরনে হালকা নীল টেরিকটের ট্রাউজারস, গায়ে সিল্ক-রঙের হাওয়াই শার্ট। নিচে নেমে বাঁধানো চাতাল ধরে রিসেপশনের দিকে চলে গেল। ম্যানেজার তার জায়গায় বসে। গত দেড় মাসের মধ্যে প্রদীপ বোস এই তৃতীয় বার এখানে। ম্যানেজার ভালোই চিনে ফেলেছে। প্রদীপ বোস

হাসি মুখে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হাউ ফার ডু আই গো ফর এ মোটর পার্টস শপ ?

ম্যানেজার রাস্তার হদিস দিয়ে জানালো ওদিকের মাইল দেড়েকের মধ্যে পাওয়া যাবে।

—অ্যাণ্ড ইফ আই রিকোয়ার এ মেকানিক ?

ম্যানেজার বলল, ওই মোটর পার্টস শপের উল্টো দিকেই একটা রিপেয়ারিং গ্যারাজ আছে। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করল, ইওর নিউ কার ইন ট্রাবল ?

—মাই নিউ কার ইন ট্রাবল। থ্যাংক ইউ।

লনে নেমে এসে ওদিকের কালভার্টের নিচে ডাভ গ্রে কালারের ঝকঝকে গাড়ি। দীপু দরজা খুলে স্টিয়ারিং-এ বসে গেটের দিকে চলল। জোরে চালানোর উপায় নেই, শক্ অ্যাবজরভারে ঢক-ঢক শব্দ হচ্ছে। ভুরু কুঁচকে নিজের মনেই গজগজ করে উঠল, নুইসেন্স ...পঁয়ষট্টি হাজারে নতুন গাড়ি করেছে সব···দুবার যেতে আসতেই শক অ্যাবজরভারের বারোটা !

ঘণ্টা খানেক আগে টের পেয়েছে ডান দিকের শক অ্যাবজরভারটার খানিকটা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। ওটা বদলাতে হবে —মেকানিক পেলে ওটা কিনে বদলানো কঠিন কিছু ব্যাপার নয়।

গেটের দারোয়ান সেলাম ঠুকল। ঠোঁটে হাসির মতো প্রায় লেগেই থাকে। মাথাও নাড়ল। সে কাউকে উপেক্ষা করে না।

ম্যানেজারের নির্দেশ মতো দোকানে চলল। দূরের দূরের পাহাড়গুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আগের দু-বারও ভেবেছিল সময় পেলে শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখবে। সেই কোন্ ছেলেবেলায় একবার এসেছিল—কিছুই মনে নেই। কিন্তু সময় হয়ে ওঠেনি। এবারও হবে না। কাল ভোরেই ছুটতে হবে।

দোকান পেল। তার উল্টো দিকে মোটর গ্যারাজ। শক্ অ্যাবজরভার কিনে সেটা লাগিয়ে নিতে আট দশ মিনিটের বেশি

লাগল না। পার্স খুলে মেকানিকটার হাতে পাঁচটা টাকা দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিষম চমক। দশ গজ সামনে দিয়ে আসছে এক মহিলা। চোখ টানার মতোই রূপসী। চলার ভঙ্গী সুঠাম। একজন অভিজাত সুশ্রী ভদ্রলোককে হঠাৎ অমন হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখেই সুন্দর ভুরুর মাঝে সামান্য ভাঁজ পড়ল—কিন্তু আরো এগোতেই পুরুষের ওই দু চোখ আর ফেরে না দেখে বিরক্তিও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মহিলা চোখ ফিরিয়ে গম্ভীর মুখে পাশ কাটালো।

—মঞ্জু!

মহিলা সবিস্ময়ে ফিরল। কয়েক পলক। তারপর ওই সুন্দর মুখে রক্তকণার ছোটাছুটি। যা দেখছে, যাকে দেখছে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। অপলক বিস্ময়ে প্রদীপ বোসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। পাশের ঝকঝকে গাড়িটাও।

—তুমি! সত্যি তুমি?

প্রদীপ বোস চেয়ে আছে। হাসছে অল্প অল্প। বলল, আমি দেখেই চিনেছি, তুমি চিনতে পারো নি।

কেন চিনতে পারেনি মুখের দিকে চেয়ে মঞ্জুলা দত্ত ঠাওর করতে চেষ্টা করল।—চিনব কি করে, আরো কত সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি, আগে চশমাও ছিল না চোখে, তাছাড়া আরো যেন কি-রকম বদলেছ বুঝে উঠছি না···

মৃদু হেসে প্রদীপ বোস বলল, তা ছাড়া তোমার মনের অ্যাসোসিয়েশান থেকেও আমি ষোল বছর ধরে অনুপস্থিত।

মঞ্জুলা সাগ্রহে চেয়ে আছে। বলল, না, ষোল বছর নয়, তার কিছু কম—যাক তার মানে তুমি বলতে চাও, তোমার অ্যাসোসিয়েশনে আমি ছিলাম তাই ষোল বছর পরেও তুমি দেখেই চিনেছ?

জবাব না দিয়ে প্রদীপ বোস হাসছে।

এখনো চোখে পলক পড়ে না মঞ্জুলা দত্তর। এমন যোগাযোগে প্রায় অবিশ্বাস্য লাগছে। চোখে মুখে একসঙ্গে অনেক কিছু জানার আগ্রহ।—তুমি রাঁচিতে কবে এসেছ?

—কাল সন্ধ্যায়।

—বেড়াতে?

প্রদীপ মাথা নাড়ল। বেড়াতে নয়।

—কাজে?

—আবার মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই।

—মঞ্জুলা বলে উঠল, তুমি কথা বলা কমিয়ে দিয়েছ দেখছি।

প্রদীপ বোসের ঠোঁটের হাসি মুখে ছড়ালো। জবাব দিল, এরকম পরিস্থিতিতে কথার থেকে চোখের দাবী বেশি।

সত্যি কিনা জানে না, প্রদীপ বোসের মনে হল মঞ্জুলা দত্তর কালো চোখের গভীরে চকিত তৃষ্ণার ছায়া দেখল একটু। তারপরেই হাসি।—তুমি বরাবরই কথক ভালো!—এখানে কোথায় উঠেছ?

—বি এন আর-এ।

মঞ্জুলা থমকালো একটু। চোখের কোণে ঝকঝকে গাড়িটা একবার দেখে নিল।—কদিন আছ?

—কাল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

চোখে চোখ। এভাবে দেখা হবার পর কালই চলে যাবে শুনে ভালো লাগল না বোঝা গেল।—তারপর কলকাতায় রওনা হবে?

প্রদীপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

—দুই একদিন থেকে যাওয়া যায় না?

—লোভ হচ্ছে··· কিন্তু হবে না, টাইট প্রোগ্রাম।

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু মুখে মঞ্জুলা বলে উঠল, তোমাদের মুখে টাইট প্রোগ্রাম শুনলে আমার রাগ হয়!

প্রদীপ হাসছে।—তুমি এখানে?

—আমি তো বরাবরই একেবারে জাঁকিয়ে এখানে!

—বিহারে কোথায় এনজিনিয়ারিং ফার্ম শুনেছিলাম দত্ত সাহেবের ?

—রাঁচিও বিহারেই। ব্যবসা ছড়িয়ে পড়তে এখানে এসে শিকড় গেড়ে বসা হয়েছে।

—তাহলে বেশ বড় ব্যাপার এখন ?

—দারুণ বড় ব্যাপার এখন ?

হেসে উঠল।—দারুণ বড় ব্যাপার—কেন, আমাকে দেখে কি রাজরাজেশ্বরীর মতো লাগছে না ?

—বরাবরই লাগত।

মঞ্জুলার কালো চোখের গভীরে আবারও কি তৃষ্ণা চিকিয়ে উঠতে দেখল প্রদীপ বোস ?

—তুমি এখানে কি করছিলে ?

—গাড়িটা একবার দেখিয়ে নিলাম। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ?

—ওই সামনের পার্কে। মঞ্জুলা হাসল।—মুটিয়ে যাওয়ার ভয়ে রোজ ছবেলা হাঁটি। জবাবের সঙ্গে সঙ্গে আরো হাসি।—এই বয়সেও কি নিজের মনে হাঁটার জো আছে—বিশ তিরিশ জোড়া চোখ ছেঁকে ধরে থাকবেই—বিরক্ত হয়েই ফিরে আসতে হয়।

প্রদীপ বলল, চোখের আর দোষ কি, বয়েসটা তো আর গায়ে লেখা নেই—তুমি খুব বদলাও নি।

—বলো কি ! পলকা খুশির অভিব্যক্তি।—বয়েস তো পঁয়ত্রিশ হল প্রায় ! তুমি চাটুচর্বায়ও পেকেছ নাকি—সেই কুড়িতে নামিয়ে আনছ !

প্রদাপও হেসেই জবাব দিল, না, অতটা নামাচ্ছি না—তবে ছেঁকে যারা ধরে থাকে তাদের চোখের দোষও দেখতে পাচ্ছি না।

—খুব হয়েছে ! ছু চোখ উৎসুক। এখন তো তোমার কোনো কাজ নেই ? থাকলেও ছাড়ছে কে, আমার ওখানে চলো—কাছেই।

প্রদীপ বোসের অনিচ্ছা নেই। তবু বলল, দত্ত সাহেব ভাববেন কে না কে এসে হাজির হল···

হাসি ছোঁয়া দু চোখ প্রদীপ বোসের মুখের ওপর আটকে রইল একটু। বলল, তোমাকে দেখলে কে-না-কে ভাবত না···যাক, তাকে পাবে কোথায়, সে আজ দিল্লি কাল বোম্বাই পরশু ইংল্যাণ্ড তরশু অ্যামেরিকা—আপাতত সে জাপানে—অত সাকসেসফুল না হলে আমি রাজরাজেশ্বরী! জোরেই হাসল।

কিন্তু এই হাসি প্রদীপ বোসের কেন যেন খুব অকৃত্রিম লাগল না। ঘুরে গিয়ে গাড়ির বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিল। মঞ্জুলা উঠে বসতে ওটা বন্ধ করে প্রদীপ বোস নিজের জায়গায় বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। মিনিটখানেক এগোতে মঞ্জুলা বলে উঠল, এক্ষুনি বাড়ি যেতে ভালো লাগছে না, চলো একটু বেড়িয়ে যাই। অসুবিধে হবে না তো?

—কিছু না, তুমি পথ দেখাও, আমি কোনো দিকই চিনি না।

—যে রাস্তায় খুশি চলো, বেড়ানো নিয়ে কথা।

গাড়ি প্রদীপ বোসের ইচ্ছেমতোই ছুটল। মঞ্জুলা এটা-ওটা বলছে। এ-দিকটায় এই, ও-দিকটায় ওই। তার ঠোঁটে হাসির মতো লেগে আছে, কিন্তু কথার ফাঁকে চোখের কোণে কেবল মানুষটাকেই দেখছে। প্রদীপের তা-ও চোখ এড়ায়নি। মঞ্জুলা থেকে থেকে হাসছে, অনেক কথাই বলে যাচ্ছে, কিন্তু প্রদীপের মনে হচ্ছে যে-কথায় পাড়ি দেওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে সব থেকে উৎসুক সেটাই আপাতত এড়িয়ে চলছে।

মঞ্জুলা সোৎসাহে বলে উঠল, আমিও এখন পাকা ড্রাইভার একজন জানো তো? কোম্পানির গাড়ি ছাড়াও বাড়িতে দুটো গাড়ি —ড্রাইভার আছে—কিন্তু যখন যেটা খুশি নিয়ে আমি একাই বেরিয়ে পড়ি। তুমি দুটো দিন থাকলে তোমাকে নিজেই সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতাম। পাগলা গারদ দেখানোরও ব্যবস্থা করা যেত···

সন্ধ্যা হয়েছে। ড্যাশ বোর্ডের লাইট জ্বেলে প্রদীপ সামনে চোখ রেখে জবাব দিল, গারদ না দেখলেও পাগল অনেক দেখেছি···

—তার মানে ? তার দিকে আধখানা ঘুরে বসল।—আমাকে ঠাসছ নাকি ?

—কি-যে বলো। নিজেকে।···তুমি নিজেও কম দেখোনি।

মঞ্জুলা ওর দিকে তেমনি ঘুরেই বসে রইল। তেমনি চেয়ে আছে। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বলল, আর ভালো লাগছে না—ফেরো।

প্রদীপ গাড়ি ঘোরালো। রাস্তার আলোর দরুন হেডলাইট বিশেষ জ্বালতে হচ্ছে না।

আবার খুট করে একটু হাসির শব্দ।—ছেলেবেলায় তোমাদের সেই গাড়িতে তুজনের বেড়ানোর কথা মনে আছে ?

—আমি কিছুই ভুলি না বড়···তাছাড়া সেটা আমার কাছে খুব ছেলেবেলা নয়। জবাবটা দিয়ে প্রদীপও হাসছে। আবছা অন্ধকারে টের পেল রমণীর তু চোখ আবারও আস্তে আস্তে তার দিকে ফিরছে।

ছোটর ওপর ছবির মতো বাড়ি। তু দিকে লন। লনের চারদিকে ফুলের বাগান। আলোয় আলোয় রাতেও দিনের মতো দেখায়। গাড়ি দেখে তকমা-পরা দারোয়ান ছুটে এসে গেট খুলে দিল। ভিতরের রাস্তা বাড়ির বারান্দার সিঁড়িতে এসে ঠেকেছে।

তুজনে নামল। মঞ্জুলা তাকে সামনের হল্ পেরিয়ে ভিতরে নিয়ে এলো। চমৎকার সিঁড়ি। সিঁড়ির দেয়ালে রঙ-বেরঙের চোখ-জুড়নো ছবি। সামনের শৌখিন বসার ঘর পেরিয়ে যে-ঘরে তাকে নিয়ে এলো, সেটা এয়ার কনডিশণ্ড। এটাও বসার ঘরই। মন খুশি হবার মতোই আসবাবপত্র, সাজসজ্জা। পরের ঘর ক'টা সম্ভবত বেড রুম—সেগুলোও এয়ার কনডিশণ্ড।

—বেশ আরাম করে বোসো। তারপর কি খাবে বলো ?

প্রদীপ বোস একটা সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে বসল।—খাবার ইচ্ছে নেই, তুমি বোসো।

—চা কফি কি-ছু না ?

প্রদীপ মাথা নাড়ল। কিছুই না।

মঞ্জুলা মুখের দিকে চেয়ে থমকালো একটু। তারপর হাসল। —ড্রিংক চলে? চললে ভালো জিনিস দিতে পারি।

প্রদীপ এরই মধ্যে ঘরের একদিকের শৌখিন কাচের আলমারির কয়েকটা বিলিতি মদের বোতল দেখে নিয়েছে। তেমনি হেসেই বলল, তুমি সঙ্গ দিলে চলতে পারে।

মঞ্জুলা সুন্দর ভ্রূকুটি করল একটু।—এমন বিরাট লোকের মিসেস আমি, একটু সঙ্গও দিতে পারব না, আমাকে এমনি গেঁয়ো ভেবেছ নাকি?

উঠে বড় টেবিলটার গায়ের বোতাম টিপল। এয়ার কনডিশন ঘর থেকে কোনো শব্দ শোনা গেল না। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে দরজা ঠেলে তকমা-পরা বেয়ারা ভিতরে ঢুকল। মঞ্জুলা হুকুম করল, সোডা গেলাস আউর আইস—বাবুর্চিকো বোলো ড্রিংককে লিয়ে তুরন্ত কুছ্ বন্দোবস্ত করনা। বেয়ারা চলে যেতে হেসে তার দিকে ফিরল, আজ শিগগীর ছাড়া পাচ্ছ না—

প্রদীপ বোস নিজের রিস্টওয়াচে সময় দেখল।—একটা ফোন করে নিই তাহলে।

ঘরের কোণেই স্ট্যাণ্ডের ওপর গাঢ় লাল নিজস্ব টেলিফোন। মঞ্জুলা সেটা স্ট্যাণ্ড থেকে তুলে এনে সামনের টেবিলে রাখল।—নম্বর বলো।

—বি এন আর হোটেল। নম্বরও বলে দিল।—ম্যানেজারকে ধরে দাও।

মঞ্জুলা ডায়েল করল। ম্যানেজারকে চাইল। তারপর রিসিভার তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

—হ্যালো···গুড ইভনিং, দিস ইজ্ প্রদীপ বোস···ইয়েস··· থ্যাংকস ফর ইওর সাজেশান, গট্ মাই কার কিওরড্···ওয়েল, ডিড এনিবডি আসক্ ফর মি?···ওয়েল, ইফ এনিবড়ি ডাজ্, প্লীজ টেল আই ওডন্ট বি অ্যাভেলেবেল বিফোর···

—মর্নিং। উল্টো দিক থেকে মঞ্জুলা হাসি মুখে ঘোষণা করল।

ফোন কানে প্রদীপ মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে হাসল। তারপর ফোনে বলল, সে···বিফোর নাইন থার্টি—ও কে? থ্যাংকস—

রিসিভার নামালো। মঞ্জুলা আবার ফোনটা জায়গায় রেখে এলো। কাচের আলমারির পাল্লা সরাতে সরাতে বলল, তোমার অনারে নতুনই বার করি একটা—

আস্ত একটা বিলিতি বোতল হাতে ফিরে এলো।

তার চলা-ফেরায় আগে যেমন মাধুর্য উপছে উঠে সুঠাম দেহে ওঠা-নামা করত, এখনো ঠিক তেমনিই দেখছে প্রদীপ বোস। বোতল হাতে কাছে আসতে বলল, দাঁড়াও—দত্ত সাহেব না-হয় জাপানে, কিন্তু আর কাউকে দেখছি না কেন···মানে, তোমার ছেলে মেয়ে—

মঞ্জুলা বোতল হাতে থমকে তাকালো। গভীর কালো দু চোখ তার চোখে স্থির হতে থাকল। তাই দেখে প্রদীপের মনে হল, সে না বুঝে কোনো নিভৃতের ক্ষতস্থানে আঁচড় বসিয়ে দিয়েছে।

তারপরেই হাসি। টেবিলে ঠক করে বোতলটা রেখে মঞ্জুলা হাসতে হাসতে বসে পড়ল। বলল, তুমি সত্যি কতটা বড় হয়েছ আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমার মতো অমন বিরাট সাকসেসফুল লোকের স্ত্রী ও-সব নিয়ে বদার করে! হল—হল, না হলে কি গেল এলো? আমার হাতে অঢেল সময়, আমি না-হয় ডাক্তার দেখালাম, কিন্তু দেখানোটা যদি অন্য তরফের দরকার হয়—তার কি এমন সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘামানো বা ফাস্ করার সময় আছে? কি-যে তুমি বলো না···

ট্রে-হাতে দরজা ঠেলে বেয়ারা ঢুকতে হাসি গেল। ঘাড় ফিরিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠল, এত্না দের্ কিঁউ?

জবাব না দিয়ে বেয়ারা দ্রুত এগিয়ে এসে মস্ত ট্রে-টা পাশের বড় টেবিলে রাখল। তারপর দুজনের মাঝে সেন্টার টেবিলটা টেনে দিয়ে গেলাস, সোডা, চিপস, বাদাম, চীজ্ ফ্রুট ইত্যাদি সাজিয়ে

দিতে লাগল। তারই মধ্যে নিঃশব্দে দরজা ঠেলে আর একজন ঢুকল, তার হাতেও ট্রে। ওটা টেবিলে নামাতে দেখা গেল, ছ'টা ডিশে এক-জোড়া করে ধোঁয়া-ওঠা বড়-বড় কাটলেট, দুরকম সস্-এর বোতল, স্যালাড ইত্যাদি।

দাঁড়িয়ে সব একবার দেখে নিয়ে ওদের মেমসাহেব বলল, ঠিক হ্যায়, আওর কুছ নহী মাঙতা—

এটুকুও ধমকের সুরে। ওরা দ্রুত চলে গেল। মঞ্জুলার মুখে তক্ষুনি হাসি। বলল, কাউকে না পেয়ে ও-বেচারাদের মাঝে-মাঝে অকারণে বকা-ঝকা করে আমি মেজাজ ঠিক রাখি।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে প্রদীপ জবাব দিল, এ-ও নতুন কিছু নয়, অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস।

মঞ্জুলা ভ্রূকুটি করে তার দিকে তাকালো একবার। তারপর হাসি মুখে বোতল খুলল। দুটো গেলাসে ঢালল। সোডা মেশালো। অভ্যস্ত হাত। একটা গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে নিজেরটা তুলল।— চীয়ারস্।

—চীয়ারস্। দেখতে দেখতে এ যে রাজসিক ব্যবস্থা করলে দেখছি।

—এখানকার ব্যবস্থা রাজসিক হবে না তো কি?

দুজনেই এরপর চুপচাপ খানিক। গেলাস দুটো থেকে থেকে উঠছে, নামছে। প্রদীপ এটা ওটা তুলে নিয়ে দাঁতে কাটছে। মঞ্জুলা থেকে থেকে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে শুধু, অন্য কিছু মুখে দিচ্ছে না। তার ঠোঁটে মাঝে মাঝে টিপ টিপ হাসি, ষোল বছর আগের মতো চোখের কোণে নয়, সোজা তাকাচ্ছে।

বারকয়েক এরকম হতে প্রদীপ জিজ্ঞেস করল, কি হল?

চোখে চোখ।—কি হবে?

—হাসছ?

—হাসিটা নতুন কি, আমি তো বরাবরই হেসে গেলাম।···সেই কলকাতার অনেক কথা মনে পড়ছিল।

প্রদীপ বোসও হেসেই বলল, আমাকে লজ্জা দিতে চাইলে মনে পড়ারই কথা—

রমণীর চাউনি মুখের ওপর এঁটে বসতে লাগল। চোখের সাদা-কালো দুই-ই চিক-চিক করছে। ঠোঁটে হাসি নেই! গলার স্বরও সুরেলা নয় তেমন।—পুরনো দিনের সবই তোমার কাছে এখন লজ্জার ব্যাপার তাহলে?

প্রদীপও সোজা তাকালো।—আমার কাছে কে বলল, তুমি লজ্জা দিতে চাইলে দিতে পারো এমন সুযোগ তোমাকে অনেক দিয়েছি—তাই বললাম।

মঞ্জুলার দু চোখ আরো চকচক করছে। ঠোঁটে হাসি ভাঙল। এক চুমুকেই গেলাসের বাকিটুকু শেষ করল। তরল সুরে বলল, মোটা হবার ভয়ে এ-সব বেশি খাই না, আজ খেতে খুব ভালো লাগছে—কেন বলো তো?

যেন গবেষণার বিষয় কিছু। অল্প অল্প হাসছে প্রদীপ বোসও।—বলতে ইচ্ছে করছে খুশি হয়েছ বলে···।

তেমনি তরল হাসি।—খুশি হয়েছি কি হইনি বুঝতে পারছ না?

জবাবে হাসি মুখে প্রদীপ তার গেলাস খালি করে দিল।

মঞ্জুলা বোতল তুলে নিল। দুটো গেলাসে ঢালল। সোডা বরফ মেশালো। গেলাস এগিয়ে দিয়ে কাটলেটের ডিশও সামনে রাখল।—এ দিয়ে খাও, বেশি জুড়িয়ে গেলে ভালো লাগবে না।

—আমি তো খাচ্ছি, তুমি তো কিছুই নিচ্ছ না।

—আমার ভালো লাগে না। ছোট করে গেলাসে চুমুক দিল। উৎসুক চাউনি প্রদীপ বোসের মুখের ওপর।—তোমাদের বাড়ির খবর কি বলো···।

কাটলেট কেটে মুখে দিয়ে প্রদীপ জিজ্ঞেস করল, আমাদের বাড়ি বলতে?

—কেন, কলকাতার তোমাদের সেই বাড়ি?

—সে বাড়ির সঙ্গে পনেরো বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। খবর রাখি না।

—কেন? হেসে উঠল।—আমার বিয়ের পর আর মন টিকল না?

—তা-ও বলতে পারো।··তবে, আমার একটা নিজস্ব জগতের কল্পনা ছিল জানো তো—বনিবনা হল না।

মঞ্জুলা উৎসুক।—সেই নিজস্ব জগতে এখন আর কোনো ফাঁকি নেই?

বার দুই গেলাসে চুমুক দিয়ে প্রদীপ বোস হেসে জবাব দিল, ফাঁকি কোনদিন ছিল না···তবে ফাঁক অনেক ছিল তো বটেই ··তার কিছুটা ভরাট হয়েছে বলতে পারো।

—কিছুটা?

—কিছুটা না তো কি সবটা? এমনভাবে বলল যার অনুক্ত সাদা অর্থ দাঁড়ায়, যাকে নিয়ে জগৎ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা সেই একজন সরে দাঁড়ালে ফাঁক কিছু থেকেই যায়।

মঞ্জুলার দু চোখ আবার চকচক করছে। গেলাসে ঘন ঘন কয়েকটা চুমুক দিল। প্রদীপের প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা।—তোমার ভদ্রলোককে তো চোখে দেখি নি, দেখার আশাও নেই—একটা ফোটো নিয়ে এসো না···দেখি।

মঞ্জুলা সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত।—কেন, নিজের কদর বাড়ানোর ইচ্ছে?

—সে আবার কি! প্রদীপ বিমূঢ় একটু।

—তার ভেতর-বার কোনটাই তোমার মতো সুন্দর নয়—হল? ···আগে বাইরেটা অন্তত খারাপ ছিল না, এখন তা-ও টাকার ছাঁচে ফেলা গোছের দেখতে হয়ে গেছে।

ফের চুপচাপ খানিক। প্রদীপ বোস লক্ষ্য করল এবারের গেলাস আগের থেকেও তাড়াতাড়ি শেষ হল। ফলে নিজের গেলাসও শেষ করল

দুজনেরই তৃতীয় গেলাস প্রস্তুত। মঞ্জুলার অত ফর্সা মুখ এখন লালচে দেখাচ্ছে। চোখের মণি চিকচিক করছে। প্রদীপ বোস উঠে আলাদা ডিশে একটা কাটলেট আর কাঁটা-ছুরি তাতে দিয়ে সামনে রাখল।—একেবারে শুধু না খেয়ে একটু অন্তত খাও।

মঞ্জুলা হাসল। কথাও রাখল। খানিকটা কাটলেট কেটে মুখে পুরল। আস্তে আস্তে চিবুনোর ফাঁকে ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল। গেলাসে চুমুক দিয়ে মুখের পদার্থ জঠরে চালান দিল। তারপর দু চোখে তার মুখখানা আটকে নিল।—তোমার নিজের কথা কিছু বলছ না কেন? আমি লজ্জা পাব বলে?

—তোমাকে বলার মতো আমার কি কথা?

—তুমি বড় হয়েছ দেখতেই পাচ্ছি···কত বড়?

—এই কথা! প্রদীপ হাসল।—তোমার যা দেখছি শুনছি সে-তুলনায় কিছুই নয়।

—বেঁচে গেছ।···তোমারও ব্যবসা নিশ্চয়?

—আমার নয়, কোম্পানির।

—ওই হল, কিসের ব্যবসা?

—ইনসুলেটেড কেব্‌লস।

—ম্যানুফ্যাকচারিং?

প্রদীপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

—সে-ও তাহলে কম ব্যাপার কি!

প্রদীপ নিরুত্তর। ধীরে সুস্থে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। না তাকিয়েও টের পাচ্ছে চকচকে দুটো চোখ তার মুখের ওপর আটকেই আছে। পরের প্রশ্নে ভিতরে ভিতরে সচকিত একটু।

—তুমি সর্বদা বলতে, আমার মতো একজন পাশে থাকলে তুমি বড় হবেই, কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না····সে রকম একজনকে পাশে পেয়েছ তাহলে?

—পেয়েছি···তবে তোমার মতো নয়।

—আমার মতো হলে তো উচ্ছন্নে যেতে···আমি কি সে-তো ভালো করেই জেনেছ···যে-রকম মেয়ে তোমার পাশে থাকলে বড় হবেই আশা করতে—সে রকমই পেয়েছ নিশ্চয় ?

প্রদীপ বোস বড় নিঃশ্বাস ফেলে হাসল সামান্য।—এভাবে বলছ কেন, তুমি আমার মনের যেখানে ছিলে সেখানেই আছ—যে এসেছে, তোমার তুলনায় অনেক তুচ্ছ।

মঞ্জুলা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। উদগ্রীব, উৎসুক।—দেখতে কেমন ?

—সে-ও তোমার তুলনায় খুব সাধারণ।

—তোমার ছেলেপুলে কি ?

—একটি মেয়ে, একটি ছেলে।

—তারা কত বড় ?

—মেয়ে দশ বছরের, ছেলে সাত বছরের।

মঞ্জুলার চোখের আলো মুখের লালচে আভা হঠাৎ যেন নিষ্প্রভ একটু। নিজের এই গেলাসও প্রায় শেষ করে আনল। বোতলটা টেনে নিয়ে ওতেই আর খানিকটা ঢেলে নিল। প্রদীপের আধা-আধি গেলাসটাতেও খানিকটা ঢালল। একটা সোডা খুলে অর্ধেক নিজের গেলাসে বাকিটা তার গেলাসে। আইসবাকেট থেকে দু টুকরো করে বরফ নিয়ে স্থির হয়ে বসে মুখের দিকে তাকালো। এয়ারকনডিশন ঘর, তবু ধপধপে ফর্সা আর পাতলা ঠোঁটের ওপরে ঘামের বিন্দু।

—বউকে পেয়ে আমাকে ভুলতে পেরেছ তো ?

জবাবে প্রদীপও চেয়ে রইল খানিক। তারপর ঠাণ্ডা অথচ গভীর গলায় বলল, তুমি ভোলার মতো একজন নও।

—কেন না, আমাকে তো তোমার ঘেন্না করার কথা ? গেলাসে চুমুক দিল, চোখ আবার একটু চকচকে।

—আমার মধ্যে ফাঁকি থাকলে ঘৃণা করতাম। তোমাকে আমি যেখানে রেখেছি সেখানে ঘৃণার ঠাঁই নেই।

মুখে যেন রক্ত উঠছে মঞ্জুলার, এক অব্যক্ত তৃষ্ণায় দু' চোখ ঝকঝক করছে।—তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না ?

—অনাদর করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। ভালোবাসি কিনা ভাবি না···কারণ ভাবতে গেলে নিজেকে কপট মনে হয়।

—দী-পু ! মঞ্জুলা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চোখে মুখে তৃষ্ণা উপছে উঠছে।—দীপু, তুমি সত্যি বলছ ? এখনো আমাকে তুমি সেই রকমই ভালোবাসো ?

কতদিন বাদে প্রদীপ বোস নিজের এই নাম শুনল ? তারও রক্তে দোলা লাগল এ-কি মদের নেশায় ? না, এটুকু নেশায় তার কিছু হয় না। স্পষ্ট করে জবাব দিল, আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আগের থেকেও ভালবাসি, আগের থেকেও তোমার ভালো চাই—

মঞ্জুলার সমস্ত শরীর কাঁপছে। এক অব্যক্ত আকুতিতে বলে উঠল, আমার ভালো কি করে হবে—বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই বুঝেছিলাম আমি কত ভুল করেছি—সেই ভুল স্বীকার করে আমি তোমাকে দু দুটো চিঠি লিখেছিলাম—ওই ভুল আমি শুধরে নেব লিখেছিলাম—তুমি বাড়ি ছাড়া হয়েছ বলে সে-চিঠি পাওনি জানতাম না—ভেবেছিলাম ঘৃণায় জবাব দাওনি। আমি স্বামাকে কাছে পেতে চেয়েছিলাম, পাইনি। আজও আমার সন্তান হতে পরে—ঘর ভরে উঠতে পারে—কিন্তু তা হবার নয়—দীপু ! আমার ভালো কি করে হবে—কি করে হবে বলো ?

···প্রদীপের মনে পড়ল, এক মহিলার সন্তান চিন্তা নিয়ে একটা বই পড়তে পড়তে সেটা ফেলে রাঁচি চলে এসেছে।

দীপু উঠল। একখানা হাত তার কাঁধে রেখে বলল, মঞ্জু, বোসো, বোসো ! ডোণ্ট ! বি হিস্টিরিক, বোসো।

বসে পড়ে মঞ্জুলা আর্ত-স্বরে বলে উঠল, হিস্টিরিক বলছ ?

তক্ষুনি জবাব দিল না। প্রদীপ বোস ফিরে নিজের গেলাসটা নিয়ে ছোট ছোট দুটো চুমুক দিল। তারপর গেলাসটা হাতে নিয়েই

আস্তে আস্তে আবার কাছে এসে দাঁড়ালো। গভীর গলায় বলল, দেখো মঞ্জু, দুনিয়ার অনেক নামী আর কর্মযোগী মানুষ নিঃসন্তান।··· নেপোলিয়ন বোনাপার্ট···লেনিন···মাও সে তুং···অষ্টম এডোয়ার্ড··· শ্রীঅরবিন্দ···জগদীশ বসু···এম এন রায়···জয়প্রকাশ নারায়ন··· আচার্য কৃপালনি···চিন্তামণি দেশমুখ—পৃথিবীতে এমন শত শত মানুষের ছেলেপুলে হয়নি···তাদের স্ত্রীরা সন্তান চায়নি এমন হতে পারে না···কিন্তু তারা সে-জন্য হতাশায় ডুবে যায়নি···নিজেকে অনেক বড় কাজে যুক্ত করেছে···স্বামীর কাজের দোসর হয়েছে···

মঞ্জুলা আবার ছিটকে উঠে দাঁড়ালো।—আমি এ-সব শুনতে চাই না দীপু, দুনিয়ায় মহীয়সী অনেক আছে···আমার স্বামীর প্রয়োজনে তার দোসরের অভাব হয় না। বুঝতে পারছ আমার কথা? তুমি আমাকে ভালবাসো স্বীকার করেছ—এ-ভালবাসার সম্মান আমি সমস্ত জীবন দিয়ে করব—জানি তোমার স্ত্রী আঘাত পাবে—কিন্তু তুমি তার সঙ্গে ছলনা করতে পারো না—তাকে দয়া করতে পারো না—

বলতে বলতে একেবারে বুকের কাছে এগিয়ে এলো, শক্ত দু হাতে তার দুই বাহু চেপে ধরল। ব্যাকুল গলায় বলে উঠল, দীপু, ব্যাঙ্কে আমার নামে অঢেল টাকা, তোমারও টাকার অভাব নেই—তোমার স্ত্রীকে দুজনে আমরা রাণীর হালে রাখব—ডিভোর্সের পরেও তাকে আমরা আপনার জন ভাবব—দীপু বলো—তোমার কথা পেলেই আমি ডিভোর্সের নোটিস দেব।

প্রদীপ বোস স্থির চেয়ে আছে। তার চোখে মুখে নাকে আর একজনের তপ্ত নিঃশ্বাস লাগছে। ধীরে গভীর গলায় বলল, আজ যদি তোমার একটি মেয়ে আর একটি ছেলে থাকত···আমার জন্যে তুমি তাদের বুকে ছুরি বসাতে পারতে?

—ছুরি! মঞ্জুলা সভয়ে দু'পা সরে এলো।

—হ্যাঁ ছুরি।···আমার মেয়ে আর আমার ছেলে আমাকে কত আপনার জন ভাবে ভাবতে পারবে না। আমাকে নিয়ে তাদের

পৃথিবী। তারা দেখবে আর একজনের ঘর ভরে দেবার জন্য তাদের বাপ তাদের নরম বুকে ছুরি বসিয়ে গেল।

মঞ্জুলার সমস্ত মুখ আস্তে আস্তে বিবর্ণ, রক্ত শূন্য। দু চোখ টান করে মানুষটাকে দেখছে।

হাতের গেলাস টেবিলে রেখে প্রদীপ বোস ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

॥ সাত ॥

হোটেল থেকে বেরুতে বেরুতে প্রদীপের সকাল ন'টা হয়ে গেল। রাতে ভাবনা চিন্তার অবসর মেলেনি। বিছানায় গা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেড় ঘণ্টা হল বিমনার মতো গাড়ি চালাচ্ছে। নিজের মনেই হাসছে মাঝে মাঝে। আবার থেকে থেকে সমস্ত মুখ বিষাদে ভরে যাচ্ছে।

…নতুন গাড়ি বিচ্ছিরি ঝাঁকুনি খেল একটা। ঝম করে শব্দও হল। মেরামতির জন্য রাস্তার একদিক এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে, কিন্তু সে-দিকটা এড়িয়ে অনায়াসে ভালো রাস্তা দিয়ে গাড়ি যেতে পারে। কিন্তু অন্যমনস্কতার দরুন এই নিয়ে চতুর্থবার গাড়ির চাকা গর্তে পড়ল।

পিছন থেকে চ্যাটার্জী-সাহেব একটু আগেও একবার ডাক দিয়েছে, একটু দেখে চালাও হে, হোয়াই সো আনমাইণ্ডফুল ?

এবারে বলল, কি ব্যাপার বলো তো বোস,—কাল রাত থেকে হঠাৎ কি হল তোমার ? রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত খবর নিয়ে জানলাম তুমি হোটেলেই ফেরোনি…তারপর এমন ঘুম ঘুমোলে যে উঠতে সকাল সাতটা…তারপর তোমার হাতে কিনা গাড়ির চাকা চার-চারবার গর্তে পড়ল। এমন কাণ্ড তো কোনদিন দেখিনি—হোয়টস্ রং ?

মুখ কাঁচুমাচু করে প্রদীপ বোস সামনে সজাগ চোখ রেখে জবাব দিল, আই অ্যাম ভেরি সরি সার অ্যাণ্ড আই বেগ টু বি এক্সকিউজড…আই উইল বি কেয়ারফুল…

পিছন থেকে চ্যাটার্জী সাহেব বলল, সে-জন্যে বলছি না—শরীর-টরীর খারাপ-হয়নি তো?

—না সার ··আই অ্যাম অলরাইট।

এরপর যতটা সম্ভব সজাগ হয়েই গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু মগজে চিন্তার জট ঘুরপাক খাচ্ছেই। কখনো হাসছে। কখনো বিষণ্ণ। শেষে বিষণ্ণই বেশি। ··যদি সত্যি কথা বলত, কি হত? যদি বলত, আজ যোল বছর ধরেই ইনস্যুলেটেড কেব্‌লস্ এর খোদ মালিকের সে আদরের ড্রাইভার ··মেকানিজম জানা ড্রাইভার বলে তার কদর আরো বেশি ··মাসে হাজার টাকা মাইনে পায় ··মালিক তার পড়াশুনার ঝোঁক দেখে আর আচার আচরণ দেখে নিজের বাড়ির একতলার মস্ত একখানা ঘরই তাকে ছেড়ে দিয়েছে ·খাওয়া খরচও লাগে না। যখন যেমন খুশি টাকা খরচ করে প্রদীপ সেই ঘরে তার জগৎ সাজিয়ে চলেছে। এই জগৎটাই তার স্ত্রী এখন ·আর ছেলে মেয়ে দুটি নয় ·কয়েক শ' মঞ্জু কি তাহলে তার পরেও অমন সব কথা বলত? তার সঙ্গে নিজের জীবন অমন আকুল হয়ে জড়াতে চাইত? যতবার চাইত ভাবতে চেষ্টা করেছে, ততবার হাসি পেয়েছে। চাইত না। তারপরেই বিষণ্ণ। মঞ্জু চাইত না বলে নয়। বিষণ্ণ, মঞ্জু সুখী নয় বলে, উত্তীর্ণ নয় বলে। ওর জীবনে এমন হাহাকার বলে। প্রদীপ বোসের আজ আর কারো ওপর অভিযোগ নেই। নিজের জগতে সে সুখী। মঞ্জুকেও খুশি দেখলে মন ভরত।

কলকাতায় পৌঁছুতে সন্ধ্যে। বাড়ি পৌঁছুতে রাত সাড়ে সাতটা। নেমে দরজা খুলে দিতে চ্যাটার্জী সাহেব নামলেন।

—আমাকে আজ আর দরকার হবে সার?

—না, ইউ ডিজারভ অ্যাবসলিউট রেস্ট।

গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে প্রদীপ হালকা পায়ে নিজের ঘরে চলে এলো। জামা প্যান্ট ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরল। সোজা বাথরুমে। বেশ করে স্নান সেরে আবার ঘরে। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ে

নিল। তারপর বইয়ের র‍্যাকের পিছনে হাত ঢুকিয়ে একটা আধখাওয়া বোতল বার করল। সস্তার মদের বোতল। সেটা নিয়ে বিছানায় বসল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চার-ভাগের তিনভাগ পড়া ফ্ল্যাগ-লাগানো বইটা চোখে পড়ল। যেটা পড়া শেষ না হতে বিছানায় রেখে রাঁচি চলে যেতে হয়েছিল।

বইটার নাম, অ্যান ইনকমপ্লিট মাদার, হার ইনকমপ্লিট চাইল্ড। বইটা টেনে নিল। এক হাতে বই, অন্য হাতে বোতল। বইয়ের বিষয়বস্তু, পুরুষ বিদ্বেষিণী এক মেয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে সন্তানের মুখ দেখেছে মা হয়েছে। তারপর থেকে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া। নিজেকে সে সম্পূর্ণ মা ভাবতে পারছে না। জঠরের সন্তানকেও সম্পূর্ণ ছেলে ভাবতে পারছে না।

বোতলের কাজ শ্রান্তি দূর করা। তারপর ঘুমিয়ে পড়া। লুব্ধ চোখে একবার বইটার দিকে আর একবার বোতলটার দিকে তাকালো। নিজের জগতে ঢুকবে না ঘুমিয়ে পড়বে?

উঠে বোতলটা যেখানে ছিল আবার সেখানেই রেখে দিল। বইটা নিয়ে শুয়ে পড়ল। কারণ নিজের মনে একটু খটকা লাগছে। ছেলে পেয়েও মাতৃত্ব যদি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, সন্তান যদি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, তাহলে প্রদীপ বোসের এই নিজস্ব জগৎটাই বা কতটুকু সম্পূর্ণ?

বইটা পড়তে হবে। পাড়ি নাকচ করার রাস্তা বার করতে হবে।

শেষ